থ্রি-এক্স

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৭০ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
অনুপ রায়

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
ধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪ কৈলাশ মুখার্জী লেন
কলকাতা-৬ ।

এক্স
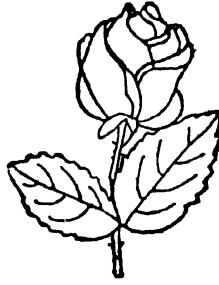
সাংবাদিক এক্স বিমান থেকে অবতরণ করলেন। ভাঙা রানওয়ে! ফাটলে ফাটলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে। টার্মিনাল বিলডিংয়ের চেহারা রানওয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে! প্রাচীনার মেকআপ নিয়ে যুবতী সাজার চেষ্টা।

বিমান থেকে নামলেন এক্স আর কয়েকজন মাত্র যাত্রী। এ দেশে খুব সাহসী মানুষ ছাড়া তেমন কেউ আসে না। ট্যুরিস্টরা আগে আসত, এখন আসতে ভয় পায়। এ দেশের রীতিই হল ল্যাংটো করে ছেড়ে দেওয়া। পাসপোর্ট, ভিসা, ফরেন মানি, জামা কাপড়, ঘড়ি ক্যামেরা সব লোপাট হয়ে যাবে। দু একটি মাত্র বিদেশী দূতাবাস এখন আছে। বাকি সব কোনও না কোনও আন্দোলনে, ফলওলা আর বিড়িওলারা পুড়িয়ে দিয়েছে। পতাকা টেনে নামিয়ে ল্যাঙট বানিয়ে বিতরণ করে দিয়েছে। এক সময় বড় বড় কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই ছিল। এখন আর কিছুই নেই। যা আছে তার চেহারা রক্তশূন্য। সকাল সন্ধে বাঁশী বাজে। কোনও কর্মী ভেতরে ঢোকে না। খোঁটায় একটা পতাকা উড়িয়ে, দরমায় কিছু স্লোগান লিখে দিনের পর দিন তারা বাইরেই বসে থাকে। তাস খেলে। চা খায়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এক-সঙ্গে চিৎকার করে, চলবে না, চলবে না। সকাল, দুপুর, বিকেল,

আর সন্ধের সময়, কেউ না কেউ এসে, একটা উঁচু টুলে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী ভাষায়, হোসপাইপে জল দেবার মতো, গল গল করে বক্তৃতা দিয়ে যায়। বক্তব্য সকলেরই প্রায় এক, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

এক্স একটি উন্নত দেশের সাংবাদিক। শুনেছিলেন পৃথিবীর মানচিত্রে আড়তর্ষ নামে একটি দেশ আছে। যে দেশে অঙ্গা নদীর ধারে, সমুদ্রে ল্যাজ ডুবিয়ে, দক্ষিণে বনভূমির রেখা টেনে, উত্তরে পাহাড়ের টোপোর পরে, আঙ্গাল নামে একটি দেশ আছে। যে দেশের অধিবাসীকে বলে কাঙাল। ভাষাতাত্ত্বিকরা আড়তর্ষ নামটির ব্যাখা করতে গিয়ে, কেউ বলেছেন, নামটি এসেছে আড়তদার থেকে। আড়তদার মানে, হোর্ডার। যে দেশে একদল মানুষ শুধু পাহাড়প্রমাণ মাল গুদামজাত করে চারপাশে লাল, নীল, হলদে, সবুজ টেলিফোন সাজিয়ে, সারাদিন কেবল, ভাও কেতনা, ভাও কেতনা করে, তারাই হল আড়তদার, আর তাদেরই কেরামতিতে তাবৎ দেশের মানুষ অর্ষে ভোগেন আর রক্তমোক্ষণ করেন। আড়ত আর অর্ষ, দুয়ে মিলে আড়তর্ষ।

নাম নিয়ে এক্সের তেমন মাথাব্যথা নেই। হোয়াট ইজ ইন এ নেম! পণ্ডিতে পণ্ডিতে কখনও মতে মেলে না। এই বাঙলা-দেশের পণ্ডিতদের কথাই ধরা যাক না। সারা জীবন পিপে পিপে নস্যি নিলেন, আর পাত্রাধার তৈল, কি তৈলাধার পাত্র করে জীবন কাটালেন। এই আড়তর্ষ এক সময় শাসন করত আংল্যাণ্ড নামক দেশের ধবলাঙ্গ আংলিশরা। তারা শেষে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে পালিয়েছে। প্রথমে তাদের রাজধানী ছিল এই আঙালের, আলকাতরা নগরীতে। পরে তারা রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেল ইল্লিতে। এ সব ঘটনার তেমন কোনও ইতিহাস নেই। আড়তর্ষের আড়তদাররা বড় ইতিহাস বিমুখ জাতি। ইতিহাস মানুষকে বড় দুর্বল করে দেয়। ইতিহাস শিক্ষা দিতে চায়। সভ্যতার পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখায়। বলে, ওই দেখ অতবড় রোমক সভ্যতা বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল। মায়া সভ্যতা দুর্ভিক্ষে শেষ হয়ে গেল। নাইল সভ্যতার হাল দেখ। এট্রুসকানরা আজ কোথায়! তা ছাড়া আড়তদাররা ইতিহাস নিয়ে কি করবে! ধুয়ে খাবে!

মাল ধরো, মাল পোরো, মাল ছাড়। মালদাররা ইতিহাসের দিকদারি পছন্দ করে না।

একস্‌ বিমান বন্দরের বাইরে এসে গাড়ির সন্ধান করতে লাগলেন। এ দেশে আসার সময় তিনি কিছু নির্দেশ পেয়েছিলেন। ছাপান নির্দেশিকা, কি করা উচিত, কি করা উচিৎ নয়। নির্দেশিকাতেই আছে, আগুলার ট্যাকসির চাল-চলন অতিশয় দুর্বোধ্য। ট্যাকসি চালকরা গুঁপো পুরুষ হলেও আচরণে রমণীর মতো। তাদের মতিগতি, দেবা ন জানন্তি, কুতঃ মনুষ্যা। যাবেন, বললেই তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলবে, না, যাব না! একগুঁয়ে ছেলে যেমন বলে, না, পড়ব না। তখন তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, প্রয়োজন হলে, নৃত্যগীতাদির আশ্রয় নেবে। মনে করবে, তুমি একজন নর্তকী, কোনও রাজপুরুষের সন্তুষ্টির জন্যে উলঙ্গ নৃত্যেও প্রস্তুত। মনে করবে তুমি এক বারবধূ। হয় তো সে রাজি হবে, বলবে মিটারে যা উঠবে, তার ওপর আরও পাঁচ দিতে হবে। তৎক্ষণাৎ তুমি রাজি হয়ে যাবে। গাড়িতে পা রাখার আগে, নম্বরটা ডায়েরিতে লিখে রাখবে; কারণ কিছু দূর গিয়েই চালক তোমার বুকে চাকু চালাতেও পারে।

নির্দেশিকায় লেখা আছে: এই কাঙালী জাতি একদা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও অহিংস ছিল। বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে, এদের মন্ত্র হয়েছিল, তৃণাদপি সুনীচেন, তরুরোপি সহিষ্ণুনা। এক ভাগ শুধু আলোচালের ভাত, আলু সেদ্ধ খেয়ে শাস্ত্র চর্চা করত। পয়সায় কুলোলে একটু গাওয়া ঘি আর পায়েসের বিধান ছিল। আর এক ভাগ, যারা নিজেদের শাক্ত বলত, তারা মাছ, মাংস, ডিম খেত। মাংস বলতে তারা বুঝত ছাগল মাংস। এই শান্তিপ্রিয় জাতির একটি মাত্রই অশান্তি জানা ছিল, তা হল মামলা, মোকর্দমা। এদের মধ্যে জমিদার শ্রেণী বলে একটি শ্রেণী ছিল, তারা লেঠেল রাখত আর জমি দখলের লড়াইয়ের সময় লাঠালাঠি করে দু চার-জনকে ভবসাগর পার করিয়ে দিত। ধবলাঙ্গ আংলিশরা দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর এরা স্বাধীন হল। তারপর পশ্চিম প্রান্তের ওমা নামক অঞ্চলের আইন্দি সিনেমায় শুরু হল সেক্‌স আর ভায়োলেনস। আগুলার আকাশে বাতাসে এখন সেই সব ছায়াছবির গান,

অষ্টপ্রহর বেজেই চলেছে। নবজাতকও শুনছে, মৃত্যুপথ-যাত্রীও খাবি খেতে খেতে শুনছে। ওই ছবির প্রতি হাজার ফুটের অ্যানালিসিস একশো ফুট নায়ক-নায়িকার প্রেমের বুলি, পাঁচশো ফুট গাছের ডাল ধরে, অথবা পাহাড়ের ঢালুতে গড়াতে গড়াতে গান, উঠে পড়ে নাচ, আবার শুয়ে শুয়ে জাপটা-জাপটি, আবার গান, আবার নাচ, বাকি চারশো ফুট, ঢিসুম ঢিসুম। এইভাবে বাইশ থেকে তেইশ হাজার ফুটের বই। এতে থাকবে বৈধ প্রেম, অবৈধ প্রেম, ব্যক্তি ধর্ষণ, গণ ধর্ষণ, উলঙ্গ নৃত্য। মূল বক্তব্য একটিই, ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়। এই সব ছায়াছবির দুষ্ট অথবা মিষ্ট প্রভাবে আর রাজনীতির জমিদারী চালে শান্তিপ্রিয় কাঙাল জাতি এখন হায়নার মতো হয়ে উঠেছে। যেখানে চড় মারলে বা খামচে দিলে চলে, সেখানে লাশ নামিয়ে দিচ্ছে।

এক্স নির্দেশিকার নির্দেশ মনে রেখে হলুদ রঙের একটি ট্যাকসির দিকে এগিয়ে গেলেন। চালক সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল দেখে এক্স অবাক। এমন তো হওয়া উচিত ছিল না। ড্রাইভার মিষ্টি গলায় বললে, যাবেন কোথায় স্যার ?

বজরঙ্গির কোনও ভাল হোটেলে !

অলরাইট স্যার। চোখ বুজিয়ে বসুন। জায়গায় এলেই বলে দোব।

চোখ বুজবো কেন ভাই ?

আপনি বিদেশী। সব কথা বলা উচিত নয় তবু বলি, আমার লাইসেন্স নেই। আমার কেন, অনেকেরই নেই। ফাঁকা রাস্তা, আমি তীর বেগে চালাব, ওভার-টেক করব। দু চারটে চাপা-টাপাও দিতে পারি। তা ছাড়া আপনি বিদেশী, রাস্তাঘাট জানা নেই। আমি আপনাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাহিল করে হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলব। যেতে যেতে আরও লোক ঢোকাব, নামাব। যত রকম কেলোর কীর্তি আছে সব করব।

এক্স খুশি হয়ে বললেন, বাঃ বাঃ বহত্ আচ্ছা, আমি তো সেইটাই চাই। এই সব দেখতেই তো আমি এ দেশে এসেছি।

তা হলে তো স্যার মুশকিল হল !

কেন ?

আমরা খুব শেয়ানা। কারুর উপকার হচ্ছে শুনলেই আমরা সামলে যাই। তা হলে আমার প্রপিতামহের একটা গল্প শুনুন। আমাদের বাড়ির পাশে, আমাদেরই একখণ্ড জমি ছিল।

গাড়ি একবার ডাইনে যাচ্ছে একবার বাঁয়ে যাচ্ছে। যেন শেষ রাতের মাতাল। এক্স জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ ভাবে চালাচ্ছ কেন?

এইটাই আমাদের আদত স্যার। আমরা সব সময় রাস্তা ব্লক করে করে চলি। পেছনে যারা আসছে, তারা আগে যাবে কেন? মনে করুন, পেছনের কোনও গাড়িতে একটা ডেলিভারি কেস আছে, কিম্বা কোনও হার্টের রুগী এখন তখন। কি মজা, কিছুতেই যেতে পারছে না, ছটফট ছটফট করছে হাঁকপাঁক করছে।

এইভাবে চালালে তো অ্যাকসিডেণ্ট হতে পারে।

পারেই তো। ও আমরা মাইণ্ড করি না স্যার। বাঙলা বলে একটা দেশ আছে, সেখানে এক কবি এসেছিলেন, তিনি লিখে গেছেন জন্মিলে মরিতে হবে। একলা মরব কেন স্যার! পাঁচজনকে নিয়ে মরব।

তোমার সেই পূর্বপুরুষের গল্পটা তাহলে বলো।

সেই যে একখণ্ড জমি, সেই জমিতে রোজ সকালে কয়েকজন প্রাতঃকৃত্য করতে আসত। জমির পক্ষে প্রাতঃকৃত্য খুব ভাল স্যার। একদিন আমার ঠাকুর্দা তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে দূর থেকে হেঁকে বললেন, বাঃ ভাই, বাঃ। বেশ প্রাণখুলে করে যাও। সামনের বছর ওই জমিতে আমি বিলিতি বেগুন, কপি আর পালংয়ের চাষ করব। ব্যস, পরের দিন থেকে তাদের আসা বন্ধ হয়ে গেল। কেন জানেন স্যার, এ দেশে একটা কথা চালু আছে, আমরা প্রাতঃকৃত্য করেও কারুর উপকার করি না।

বাঃ, বড় ভালো নিয়ম।

আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। এ দেশে প্রাণসাগর বলে এক মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। তিনি মানুষের খুব উপকার করতেন, আর যাদেরই তিনি উপকার করতেন তারাই তাঁকে আছোলা বাঁশ দিত। দু-এক দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন, কোথায় এসেছেন।

দূরে কোথাও বিস্ফোরণের শব্দ হল। বেশ জোরাল আওয়াজ। একবার নয়, পরপর, বেশ কয়েকবার। এক্স জিজ্ঞেস

করলেন, কি হচ্ছে ভাই! বলা শক্ত স্যার। তবে যে কোনও তিনটে ব্যাপারের একটা হতে পারে। যেমন, আলকাতরার ময়দানে, পূর্ব আঙাল ভার্সাস কলাবাগানের খেলা ছিল। যে কোনও একপক্ষ জিতেছে। তা না হলে আংল্যাণ্ডে, আংলিশের সঙ্গে আড়তর্ষের টেস্ট ম্যাচ ছিল। সেখানে হয় তো কিছু একটা হয়েছে। তা না হলে, ইলেকশান আসছে স্যার দুদলে একটু বোমাবাজি চলছে। ওই আর কি, দুচারটে লাশ পড়ে যাবে। এ দেশের ছেলেদের মা-বাপেরা সব সাইডিং-এ চলে গেছে। বাপ হয়েছে নেতারা আর মাল হয়েছে মা।

পাশের একটা রাস্তা থেকে হই হই করে একদল ছেলে বেরিয়ে এল। তারা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নেচে কুঁদে এক্সের গাড়িটা থামিয়ে ফেলল। একজন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বললে, এই যে মাল নেমে পড়। গাড়িটা আমাদের চাই।

বলতে বলতেই ছেলেটি এক্সের হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারল। এক্স মনে মনে একটু হাসল। এত সব প্যাঁচ-পয়জার তার জানা আছে, এক ফুঁয়ে সব কটাকে শুইয়ে দিতে পারে। তা করলে খেলাটাই মাটি হয়ে যাবে। তার ওপর হুকুম আছে, প্রতিবাদ নয়, অংশগ্রহণ করাই হবে তোমার কাজ। সব কিছু হতে দেবে।

একজন বললে, ফরেনার গুরু।

আর একজন বললে, মালটা ছিনিয়ে নে।

তৃতীয়জন বললে, কুইক, মামা আসছে।

এক্সের ব্রিফকেস ছিনিয়ে নিয়ে যুবকদল গাড়িতে উঠে বসে বলতে লাগল, চলো চলো, পটুর পেট ফেটে গেছে।

ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, চলি স্যার। বরাতে আজ দুঃখ আছে আমার।

একজন ধমকে উঠল, চোপ্ শালা। বেশি বাতেলা! পোস্টার করে ছেড়ে দোব।

জনশূন্য রাস্তায় এক্স হেসে উঠলেন। বোকারা একটা ডামি ব্রিফকেস নিয়ে গেল। ভেতরে কিছু ছেঁড়া কাগজ আর একটা লোহার টুকরো ছাড়া আর কিছু নেই।

এক্স গোটা কতক গাড়িকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন।

কেউ গ্রাহ্যই করল না। দু একটা প্রাইভেট গাড়িকে বিলিতি কায়দায় বুড়ো আঙুল দেখালেন। অন্য দেশ হলে থেমে লিফ্‌ট দিয়ে দিত। নির্দেশিকা বলছে, আঙাল দেশে বসবাসকারী আড়োয়ারিরা কিম্বা ধনবান কাঙালরা, যতই শিক্ষিত, বিদেশ ঘোরা হোক না কেন, আচরণে তারা বন্য মানুষের মতো। আমি আমার, তুমি তোমার, এই হল তাদের নীতি। এদের সমাজে যে নীতি বাক্যটি সব চেয়ে বেশি প্রচলিত, তা হল, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

গোটা দুয়েক ট্যাকসি দাঁড়িয়েছিল, কোথায় জিজ্ঞেস করেই পালাল। নির্দেশিকা বলছে, এ-রকম পরিস্থিতিতে তুমি বলে দেখতে পার, আমি ডাকাতি করতে যাব, তাহলে ট্যাকসি হয় তো তোমাকে নিয়ে যেতে রাজি হবে। আঙাল দেশে নীতিভ্রষ্ট, মদ্যপ, মাস্তান শ্রেণীর মানুষদের খুব খাতির। কারণ এ দেশে অনেক মহাপুরুষ জন্মে গেছেন, অনেক ধর্মের উপদেশ দিয়ে গেছেন। সব এখন পচে গেছে। মহাপুরুষদের মাথা কাটার যুগ চলেছে এখন। ওমার আইন্দি ছবির হিরো, হিরোইনরাই এখন উপাস্য।

এক্স হাত তুললেন। ঘ্যাঁচ করে একটা গাড়ি দাঁড়াল। এক্স বললেন, ডাকাতি করতে যাব। চালক সামনের দরজা খুলে দিয়ে বললে, আসুন আসুন। এখন তো কোনও ব্যাঙ্ক খোলা নেই স্যার!

এক্স গম্ভীর গলায় বললেন, ব্যাঙ্ক নয়, হোটেলে।

হোটেলে। কেয়া দিশ। হোটেলে তেমন ডাকাতি এখনও হয় নি। দারুণ জমবে গুরু। গরমেন্দ্রর হীরা চোর বইটা দেখেছেন বুঝি স্যার! লেখা যা নেচেছে মাইরি। সিটি দিয়ে দিয়ে আমার গলা চিরে গেসল। তিন দিন ঢোক গিলতে পারি নি। তা গুরু গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে হত না? চেম্বার টেম্বার সব ঠিক আছে তো!

এক্স খসখসে গলায় বললেন, চুপ। জোরে চালাও। একটু এদিক সেদিক হলে মাথা ফুটো করে দোব।

এদিক সেদিক হবে না ওস্তাদ। আমার প্রাইভেট জায়গা আছে। বোতোল, গেলাস, বরফ, সব পাওয়া যায়।

এক্স বললেন, বার্ক হোটেল।

জী ওস্তাদ।

এক্স হোটেলে এসে প্রথমেই পুলিসকে জানালেন, তিন চার, তিন চার নম্বর গাড়ির পেছনে তাঁর সুটকেসটা চলে গেছে যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পুলিস বললে, তোমার কেস রেজিস্ট্রেশন নম্বর এক লক্ষ বাইশ। এটা বিরাশি সাল, নব্বই সালে একবার খবর নিও।
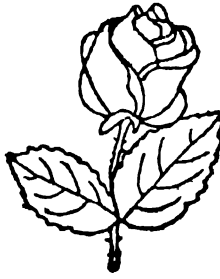
এক্স হোটেলে ঢুকে, নিজের ঘরে এসে রেকটাম থেকে গোটা কতক সোনার বার বের করে ফেললেন। এই যথেষ্ট। মাস খানেক রাজার হালে চলে যাবে। দরজায় টুকটুক করে টোকা পড়ল। স্মার্ট চেহারার এক জন আড়োয়াড়ী ঢুকলেন।

কিছু আছে?

এক্স জানতেন, এই রকম একজন কেউ আসবেই। বাঘের পেছনেই ফেউ থাকে। জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে খাদ্যাবশেষ ফেললেই হাঙরের ঝাঁক তোলপাড় করে আসে।

হ্যাঁ আছে। গোল্ড বার।

সঙ্গে সঙ্গে দেনাপাওনা মিটে গেল। এদের অনেক টাকা। ব্ল্যাক মানিতে ব্ল্যাকবেরির মতো টুসটুস করছে। আংলিশরা কি শোষণ করত! এরা তাদের বাবা। আড়তবর্ষে প্যারালাল ইকনমি একটা সাদা একটা কালো। গোটা ছয়েক রাজনৈতিক মতবাদ পাশাপাশি চলেছে। কখনও এর সঙ্গে ওর হাত মিলছে, কখন ওর

সঙ্গে এর। যে কেউ এসে যার তার বিছানায় রাত কাটিয়ে যেতে পারে। যৌতুক যদি গদি হয়, যে কোনো বিবাহই চলতে পারে। সবর্ণ. অসবর্ণ, নির্বিচার ব্যবস্থা। লালে লালে। সাদায় সাদায়। সাদায় লালে। এ দেশে গরিবে ট্যাক্স দেয়, বড় লোকে কায়দা করে গলে যায়। পার্টিফাণ্ডে টাকা ফেলতে পারলে সাতখুন মাপ। এই দেশেরই এক কবি লিখেছিলেন, এ মুলুকে যিনিই সাপ, তিনিই ওঝা।

দরজায় আবার টোকা। অ্যালবাম হাতে এক ছোকরা এলেন।

নিঃসঙ্গ বোধ করছেন স্যার ?

তা একটু করছি ।

সঙ্গী চান! এই নিন, কাকে চাই বলুন। সব রকম পাবেন।

সারি সারি মুখ। বয়েস, জাতি, দেহের বর্ণনা।

এক্স বললেন, আমি কাঙালী চাই। একটু শিক্ষিতা।

হয়ে যাবে। কখন চাই ?

এখুনি।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

এক্স এখানে ফুর্তি করতে আসেন নি। এসেছেন, মানুষের হালচাল দেখতে। শেষ যুদ্ধের আগে, সম্পূর্ণ ধ্বংসের আগে, এই ঘূর্ণায়মান গোলকে মানুষ কোথায় কেমন ভাবে বেঁচে আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবির তরুণী সজীব হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। এক্স একবার ভালো করে দেখে নিলেন। বয়েস কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। মুখ চোখের চেহারা দেখে প্রোফেসানাল বলে মনে হল না। এ দেশে এখন তিনটি সম্প্রদায়, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত। দুপাশে দুই দেয়াল, হ্যাভস আর হ্যাভনটস। সাপের মুখে চুমু খেয়ে, বাঘের গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে এরা বেঁচে আছে। দুটো দেয়াল দুদিক থেকে এসে পিশে ফেলার চেষ্টা করছে। কার্টুনিস্ট যদি ছবি আঁকতে চাইতেন, তা হলে এই ভাবে আঁকতেন, এ দেয়ালে দুটো হাত ও দেয়ালে দুটো পা দিয়ে, ইনটেলেকচুয়াল চেহারার একটি লোক প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলে রাখার চেষ্টায় ধনুকের মতো হয়ে গেছে, আর তার মুখ দিয়ে জিভের বদলে হাত চারেক লম্বা একটা কাগজের স্পুল বেরিয়ে

এসেছে। তাতে লেখা, ইট ইজ ফ্রম দি মিড্‌ল ক্লাস, দ্যাট দি গ্রেট মেন অফ দি ওয়ার্ল্ড অ্যারাইজ!

সেই এক পুরনো গল্প। এক্সের বিশেষ কোনও প্রশ্ন নেই। পৃথিবীর প্রায় সব মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হয়ে গেছে। পাঁচ হাজার বছর পেছলে যা, পাঁচ হাজার বছর সামনে এগোলেও তাই। মানুষ, সেই এক মানুষ, চিরকালের মানুষ। দুটি মাত্র শ্রেণী, অত্যাচারী আর অত্যাচারিত। মোড়কের লেবেল, সমাজতন্ত্রই হোক, গণতন্ত্রই হোক আর ধনতন্ত্রই হোক ভেতরে সেই এক মাল, মানুষ। যীশু যে বছর জন্মালেন, সেই বছর রোমে গণিকার সংখ্যা ৩৬ হাজার। এ হল অফিসিয়্যাল ফিগার। আসল সংখ্যা এর দ্বিগুণ হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভাবতেও মজা লাগে ১১৭০ সালে স্পেনের অ্যাবট নিজের জন্যেই সত্তর জনকে রেখেছিলেন। ১৫০১ সালে ষষ্ঠ পোপ অ্যালাসাণ্ডো এক বিশাল জমায়েতে ষাট জন গণিকাকে এনে বিবস্ত্র করে নাচিয়ে ছিলেন, তারপর সঙ্গমের প্রতিযোগিতায় পুরুষদের আসরে নামিয়ে ছিলেন। ভাবা যায় না।

এক্স জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম?

শীলা। এই নামই এখানে চালু, আসল নাম আলাদা।

তোমার পেশা?

সকালে একটা চাকরি। বিকেলে এই পার্ট টাইম।

রোজগার?

অসম্ভব ভালো। ইচ্ছে করলে, গাড়ি বাড়ি করতে পারি।

করো না কেন?

প্রথমত ক্লান্তি। কিছুই ভালো লাগে না। কাঙালীরা ভীষণ ফ্রাসট্রেসানে ভুগছে। কিছু করার কথা হলেই নেতিয়ে পড়ে, কি হবে ওসব করে! দ্বিতীয়ত, আমার ফ্যামিলিতে অজস্র বেকার। বাবা বেকার, ভায়েরা বেকার, বোনেরা ছোট ছোট। কিছু করা মানেই, সব এসে জুটবে। তা ছাড়া সামাজিক প্রশ্ন, এত টাকা তুমি পেলে কোথায়? এ দেশের নিয়ম হল, সবাই জানবে কিন্তু গোপন থাকবে। একেই আমরা বলি ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচ।

তোমার টাকা তাহলে কোথায় যায় ?

লাকসারিতে। স্রেফ উড়িয়ে দি। বিলিতি জিনিস কিনে, খেয়ে, বেড়িয়ে শেষ করে দি। প্রাইভেট ট্যাকসি ভাড়া করে দেশ ভ্রমণে যাই। টাকা ওড়াবার নানা রাস্তা বের করা খুব সহজ কাজ। আপনি কি সারা রাত আমাকে এই সব প্রশ্ন করবেন ?

না, না, এ সব খুব পুরনো প্রশ্ন। উত্তরেও কোনও নতুনত্ব নেই। তোমার লেখাপড়া কতদূর ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙিয়েছি।

আমি তোমার মতোই একজন সঙ্গী খুঁজছিলুম শীলা। মাস-খানেক আমি এ দেশে থাকব। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে ?

থেকে কি করব ?

প্রথমে, তুমি আমাকে এই হোটেলের বাইরে কোথাও একটা থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

তারপর ?

আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেশের হালচাল একটু দ্যাখাও।

আপনি কি জেমস বণ্ড ?

না, আমি একজন পথিক। ইন সার্চ অফ ডেমোক্র্যাসি অ্যাণ্ড সোস্যালিজম। মানুষের স্বপ্ন কতটা দুঃস্বপ্ন হয়েছে দেখতে চাই।

লাভ ?

সেইটাই আমার জীবিকা।

প্রস্তাবে রাজি হলে কি দেবেন ?

যার জন্যে তুমি পথে নেমেছো। টাকা।

আপনি স্বপ্ন তৈরি করতে পারেন ?

না। স্বপ্ন কেউ কারুর জন্যে তৈরি করতে পারে না। নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়।

বেশ, রাজি। আমার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে থাকবেন ?

তাঁর আপত্তি না থাকলে, আমার আপত্তি নেই।

তার আপত্তি হবে না। সে খুব লোভী; অথচ উপার্জনের সামর্থ্য নেই।

সে তো কালকের কথা, আজ আমি কি করব! হ্যাভ সাম সেক্স॥

প্রয়োজন নেই। নিজেকে খেলো কোরো না।

খেলো না করি, খেলা তো করতে পারি।

আমার খেলার বয়েস যে চলে গেছে শীলা!

তা হলে আমি যাই। ও ছাড়া আমার অন্য আর কিছু জানা নেই।

তুমি চার্লির মডার্ন টাইমস দেখেছ!

দেখেছি।

তা হলে বুঝতে পারবে, তুমি কে, আর আমি কে! আমরা কেবল নাট আর বল্টু টাইট দিয়ে চলেছি।

অত ভাবতে পারি না।

তা হলে এসো। খাওয়া যাক—এ প্রিমিটিভ অ্যাকটিভিটি। তোমার ভালো লাগবে।

আপনি কি ড্রাগ অ্যাডিক্ট?

না।

আপনি কোন্ দেশের মানুষ বলুন তো! ড্রাগস নেই, ড্রিংকস নেই, সেক্স নেই।

তোমাদের এখানে ওটা খুব চলছে বুঝি?

হ্যাঁ। যুবক, যুবতী, ডাক্তার, প্রফেসার, সাকার, বেকার, এখানে সকলেরই পা টলছে। আমরা একটা কিছু ভুলতে চাইছি।

তোমরা যে মানুষ এইটাই মনে হয় ভুলতে চাইছ?

সেটাও ঠিক জানা নেই।

গভীর রাতে, এক্স তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে সব দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাদের সকলেরই এক হাল। জাতীয়তাবাদ দখিনা বাতাসের মতো। উঠেই যা পড়ে যায়। নৌকো দুভাবে চলে, পালে আর দাঁড়ে। পালে সব সময় বাতাস থাকে না। মাঝে মধ্যেই চুপসে যেতে পারে। পালের ভরসায় হাল ছেড়ে দিলে যা হতে পারে তাই হয়েছে। পৃথিবী যদি বিরাট একটা দাবার ছক হয়, তা হলে এই মুহূর্তে দুপাশে দুই রাজা, দুটি তন্ত্রের ধারক। মাঝে সব বোড়ের দল। একবার এ খাচ্ছে, একবার ও খাচ্ছে। ছকে আড়াই চালের ঘোড়াও কিছু আছে। অশ্ব আছে অশ্বারোহী নেই। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে চৈনিক

দার্শনিক মেনসিয়াসের কথা। পৃথিবীতে দার্শনিকদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন অর্থনীতিবিদ আর যন্ত্রবিদদের যুগ চলছে। তবু মেনসিয়াসের কথা মনে পড়ছে। এই কারণে মনে পড়ছে, মানুষের প্রত্যাশা কোনও কালেই পূর্ণ হবার নয়। মেনসিয়াস লিখছেন, পাঁচশো বছরে অন্তত একবার ভালো কোনও শাসক আসা উচিত। যাঁর রাজত্বকালে মানুষ একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারে। সেই সময় উত্তীর্ণ। তার মানে ঈশ্বরই চান না, পৃথিবীতে শান্তি আসুক, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। মানুষের বরাতে যদি এই লেখা থাকে বিধির যদি এই বিধান হয়, মানুষ কি করতে পারে!

কাওৎসুর কথা মনে পড়ছে: মানুষের স্বভাব হল ঘূর্ণি-জলের মতো। পূব দিকের ছিদ্র খুলে দাও, জল পূব দিকে ছুটবে, পশ্চিমের পথ খুলে দাও, পশ্চিমে ছুটবে। মানুষের স্বভাব জলের মতো, উদাসীন, ভালোও বোঝে না খারাপও বোঝে না। যে কোনও একটা দিকে ছুটে বেরিয়ে গেলেই হল।
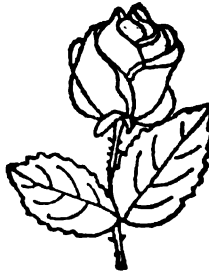
শীলার সঙ্গে এক্স যখন হোটেলের বাইরে এলেন তখন মধ্যদিন। এরই মধ্যে বেশ কিছু মানুষ নেশার পথে সূর্যের চেয়ে বেশি ঢলে পড়েছে। রেস্তোরাঁর আধো আলো আধো অন্ধকারে বসে, এক বড়া এক ছোটা করছেন। এঁদের মধ্যে ছাত্র আছে, ব্যবসাদার আছে, জীবিকাহীন অলস মানুষও আছে! এক্স নরকের একটা ছবি দেখেছিলেন। কার নরক মনে নেই, মিলটনের না দান্তের। অন্ধকারের ঘূর্ণিতে উৎক্ষিপ্ত যন্ত্রণাকাতর মুখ আর বাহু।

এক্স জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দেশে এত তাড়াতাড়ি রাত শুরু হয়ে যায় ?

আমরা যে রাত্রির যাত্রী।

তুমি কি জ্যাক ডানফির বই পড়েছ ?

না, আমরা বিশেষ পড়ি-টড়ি না। ভীষণ একঘেয়ে লাগে। ক্লান্তিকর। হাই ওঠে। ঘুম পায়। এ দেশের বেশীর ভাগ সাহিত্যে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন। যে মনে কিছুই নেই, সে মনে তিন চার পেগ প্রেম ঢেলে দেবে; সাত আট পেগ কাম, দুই তিন পেগ ঘৃণা, সমান মাপের হতাশা। সেই ককটেলের নাম নায়িকা। ঘিরে থাকবে একগাদা পুরুষ চরিত্র। সে দলে থাকবে নেতা, ব্যবসাদার, বয়স্ক পারভারটের দল, থাকবে রাগী ছোকরা, ঘা খাওয়া ঘেয়ো সংসারী মানুষ। পুরো ব্যাপারটা থাকবে স্বচ্ছ নীল নাইলনের মশারির মধ্যে। যার নাম শৌখিন সমাজচেতনা, এক ধরনের হাহাকার। শিশুদের পুতুল খেলার মতো আমাকে একবার করে জামা কাপড় পরানো হবে একবার করে খুলে উলঙ্গ করা হবে। কখনও আমি কুমারী মাতা, কখনও আমি ছোবল মারা সাপ, কখনও আমি বিদ্রোহী, কখনও আমি পরাজিতা, কখনও আমি বিজেতা। লিখতে লিখতে লেখক ভাববেন, মালটা ঠিক জমছে তো, পাবলিক ঠিক খাবে তো। সম্পাদক প্রথম থেকেই বলে আসছেন, পাঠকই সুপ্রিম কোর্ট। প্রকাশক লেখককে বেস্ট সেলারের ফর্মুলা বাতলাবেন, একটু গ্রামট্রাম রাজনীতি চটকে দিন, দু'চারটে ব্যভিচারী আড়তদারের গলায় ছুরি চালান, সেই ফাঁকে রগরগে একটু সেক্স। মালটা যেন সিনেমায় ধরে। সাহিত্য এখন মাল। ও মাল পচে গেছে, কচলে কচলে তেতো হয়ে গেছে। এ দেশে এখন প্রাচীন সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, ধর্ম আর ছোটদের বই খুব চলছে। আমাদের মতো পাঠক পাঠিকারা অ্যাডভেনচার, কমিক্স, কার্টুন কিম্বা ফেয়ারী টেলস সময় পেলে পড়ে, নয় তো ঘুমিয়ে পড়ে।

এক্স সহজেই একটা ট্যাকসি ধরে ফেললেন। এই সময়টায় শাট্ল খদ্দের তেমন হবে না। কাঙালীরা সব এখন সেরেস্তায়। প্রেমিক প্রেমিকারা নুন শোয়ে ঢুকে আছে। গাড়ি আলকাতরা নগরীর দক্ষিণ দিকে ছুটতে লাগল।

এক্স একটা সিগারেট বের করে শীলার হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, চলে তো ?

শীলা মুচকি হেসে বললে, এর চেয়ে বড় জিনিস যখন চলছে !

তোমরা তো এক সময়ে ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলে ?

কে ছিল জানি না, আমার ধারণা ঈশ্বর মারা গেছেন। সেই পরম পুরুষ পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁর সমাধি-ফলক। লিভিং এপিটাফ। ঈশ্বর-টিশ্বর জানি না, তিনিও আমাদের জানেন বলে মনে হয় না। বার কতক প্যান্ডেল বেঁধে শহর পুজোর আমোদে মেতে ওঠে। তাতে উৎসব আছে ধর্ম নেই। গণ-ধর্ষণের মতো গণ-ধর্ম। লাগাতার আইন্দি গান, হই হই, রই রই। চাঁদা আদায় নিয়ে খুন-খারাবি। গত বছর একজনকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। আর একজনের হাত দুটো খুলে নিয়েছিল কনুইয়ের কাছ থেকে।

অবিশ্বাস্য। সামান্য চাঁদার জন্যে মানুষ এত নৃশংস হতে পারে !

কাঙালীরা সব পারে। এই তো সেদিন, দুটো বাচ্চা ছেলে লরির একজন ক্লিনারকে কুপিয়ে মেরেছে। বাঙলাদেশ বলে একটা দেশ আছে, নাম শুনেছেন ?

অবশ্যই শুনেছি।

সেই দেশে শ ছয়েক বছর আগে ঠ্যাঙাড়ে বলে এক সম্প্রদায় ছিল। তারা পাবড়া ছুঁড়ে পথচারীকে ঘায়েল করত। তার সব কেড়ে নিয়ে জঙ্গলের ধারে জ্যান্ত পুঁতে দিত। এমন ঘটনাও ঘটে গেছে, মারার পর দেখা গেল তার ট্যাঁক খালি, একটা কানা কড়িও নেই। তখনকার বাঙলা আর এখনকার বাঙলায় খুব একটা তফাৎ নেই।

গাড়ির গতি ধীরে ধীরে কমে এল। বিশাল এক মিছিল আসছে। ফ্ল্যাগ, ফেসটুন, স্লোগান। সর্দার পোড়ো যেমন পাঠশালায় নেচে নেচে বলত, দু এককে দুই, সেই রকম মিছিলের সর্দাররা থেকে থেকে নেচে উঠে কি যেন বলছে সঙ্গে সঙ্গে সেথোরা শরীর দুলিয়ে বলছে, চলবে না. চলবে না। সর্দার বলছে, প্রতি-

ক্রিয়াশীলদের কালো হাত, সেথোরা সঙ্গে সঙ্গে ভারি গলায়, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

এক্স জিজ্ঞেস করলেন, এরা এত অসন্তুষ্ট কেন?

শীলা হেসে বললে, এই ধরনের রুটিন মিছিল এ শহরে রোজই বেরোয়। যেটা সবচেয়ে দীর্ঘ সেটা শাসক দলের। যেটা মাঝারি সেটা হল ক্ষমতাচ্যুত শাসক দলের। যেগুলো একেবারে ছুটকো ছাটকা সেগুলো হল ফেউ দলের।

হোয়াট ইজ ফেউ?

ফেউ এক ধরনের প্রাণী, শেয়ালের মতো দেখতে। বাঘের পেছন পেছন ঘোরে। ফেউয়ের ডাক শুনলে বুঝতে হবে বাঘ বেরিয়েছে।

এটা কোন দলের মিছিল?

এ আপনার শাসকদলের নিয়ম মাফিক মিছিল। দৈর্ঘ্য আর ফেস্টুন দেখে চিনে নিন।

যাঁরা শাসন করছেন তাঁদের আবার কিসের বিক্ষোভ!

একে বলে জুজুর ভয়। এ দেশের শিশুরা ঘুমোতে না চাইলে মা বলেন, ওই, এক্ষুনি জুজু আসবে, ঘুমিয়ে পড়ো বাবা।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এ রাজনীতিতে তোমার বিশ্বাস নেই!

কোনও নীতিতেই আমাদের আর বিশ্বাস নেই।

দুর্নীতি?

সে রাস্তা সকলের জন্যে খোলা নেই। আগে ক্ষমতা, পরে দুর্নীতি। রাস্তার মানুষের জন্যে একটা রাস্তাই খোলা, আসার আর যাওয়ার।

বাঃ বলেছ ভালো। তোমার দেশ একটা ব্যাপারে খুব সফল হয়েছে বলতে হবে। অর্থনৈতিক প্রগতি না আসুক, দার্শনিক প্রগতি এসে গেছে।

জীবন আর মৃত্যুর তফাৎ ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

মিছিল হই হই করে উঠল, মার শালাকে, মার শালাকে। ফটাফট বাঁশের শব্দ। একটা প্রাইভেট গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন ভেঙে চুরমার। সামনের আসনে চালক দু-হাতে মাথা ঢেকে একপাশে কাত হয়ে লাঠির আঘাত ঠেকাবার চেষ্টা করছে। পেছনের আসনে এক

মহিলা বসেছিলেন, তাঁর চুলের বিনুনি ধরে একজন হিড়হিড় করে টানছে। ভদ্রমহিলার মাথা জানালার বাইরে আধ হাত বেরিয়ে গেছে। দশ হাত দূরে একজন ট্রাফিক পুলিস। কয়েক ফার্লং দূরে মিছিলের ন্যাজের কাছে একটা পুলিসের জীপ। মিছিলের এক ভাগ বলছে, চলছে চলবে। আর এক ভাগ বলছে, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। মাঝের ভাগ চিৎকার করছে, মার শালাকে, মার শালাকে। রাস্তার চতুর্বাহুতে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে মাইলের পর মাইল গাড়ির সারি। বহু দূরে একটা দমকলের গাড়ি আপ্রাণ ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। এগিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা। সারা শহর যেন খেপে উঠেছে। শেষের সে দিন যেন ঘনিয়ে এসেছে।

একস জিজ্ঞেস করলেন, ওই গাড়ির আরোহীদের ওপর ওদের অত রাগ কেন?

গাড়িটা মনে হয় পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। মিছিলকে অপমান করার সাজা প্রাণদণ্ড। গণ-আদালত আর আইন আদালত পাশাপাশি চলছে এ দেশে। মানুষ খুন করলে হয়ত যাবজ্জীবন হবে, মিছিল ফুঁড়ে চলে যাবার চেষ্টা করলে মৃত্যুদণ্ড। মেরে মেরে শেষ করে দাও।

পুলিস কিছু বলবে না?

অসুবিধে আছে। পতাকার রঙ দেখুন, এ মিছিল উঠে এসেছে ক্ষমতার সাজঘর থেকে।

একসের মনে হল, সে যেন সতীদাহের দৃশ্য দেখছে। একদল চুলের মুঠি ধরে একজন মহিলাকে টানতে টানতে চিতার দিকে নিয়ে চলেছে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে বলে, সঙ্গে চলেছে, বেজে বেজে, খোল-কত্তাল। একটা চূর্ণ-বিচূর্ণ গাড়ি, দুজন ক্ষতবিক্ষত পুরুষ আর অর্ধ উলঙ্গ একজন মহিলাকে পথে ফেলে রেখে রহস্যময় মিছিল হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে গেল। আলকাতরা শহরে কুতুব-মিনারের মতো, শহরের মধ্যস্থলে বিশাল একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। যে স্তম্ভকে কাঙালীরা বলে, লিঙ্গুয়ামেন্ট। এই সংকর শব্দটির অর্থোদ্ধারে আবার ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রয়োজন হবে। লিঙ্গ হল পুরুষত্বের প্রতীক। ভারতবর্ষের শৈবরা লিঙ্গের উপাসক। আড়তীয়রা ভারতীয়দের কাছ থেকেই শব্দটি পেয়েছে। লিঙ্গের সঙ্গে

মনুমেন্ট জুড়ে তৈরি করেছে, লিঙ্গুয়ামেন্ট। মৃত্তিকা যেন আকাশের সঙ্গে রমণোদ্যত। কালের বুকে থমকে আছে একটি শব্দ—মারো। শব্দ দিয়ে মারো, অস্ত্র দিয়ে মারো, হাতে মারো, ভাতে মারো, জাতে মারো, মারো, শিক্ষায় মারো, ধনে মারো, জনে মারো, দিশাহারা করে মারো। সংস্কৃতিতে অনন্ত মারের প্রতীক এই লিঙ্গুয়ামেন্ট। আগে যত প্রতিবাদ সভা হত, সবই হত এই স্তম্ভের পাদদেশে। ইদানীং সেখানে একটি ভাগাড় তৈরি হয়েছে। কাঙালীদের উপাস্য দেবতা হল, আঁস্তাকুড়, ভাগাড়, দ'ক, নর্দমা। আংলিশরা তাঁদের শাসনকালে এই সব একান্ত ভালো লাগার জিনিস কাঙালীদের জীবন থেকে একে একে কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। রাজা মেছুনিকে শুতে দিলেন পালঙ্কে। ফুরফুরে ফুলের গন্ধ, সিল্কের মশারি। মেছুনির ঘুম আর আসে না। মাঝরাতে চুপি চুপি উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল। পড়ে ছিল আঁশ চুবড়ি। জলের ঝাপটা মেরে মাথার কাছে রাখল। সেই পরিচিত গন্ধ, পরিচিত পরিবেশ ফিরে এল। এবার আর ঘুমের অসুবিধে হল না। চোখ জুড়ে এল।

আংলিশরা চলে যাবার পর কাঙালীরা, সেই আঁশ চুবড়ি তুলে নিয়ে এসেছে। সিসটেমেটিক্যালি, আঁস্তাকুড়, খানাখন্দ, ভাগাড়, পেটমোটা নর্দমা তৈরি করতে শুরু করেছে। মশার চাষ, মাছির চাষ শুরু হয়েছে। বাহবা বাহবা প্রশংসাধ্বনি সর্বত্র—তোমরা, আবার আমাদের সেই নিজস্ব জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ। এতকাল আমরা ছিলুম নিজভূমে পরবাসী। নাউ, উই ফিল ভেরি মাচ অ্যাট হোম। একেই বলে প্ল্যানিং-এর শিরতাজ। তোমাদের আড়ত-ভূষণ উপাধি দেবো। পেয়েছি আমাদের সেই জীবন কাব্যালোক—

গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাই পাঁশ আরো কত কী যে!

জয় চোরপোরেসান। জয় জয়কার। মশাই কত বড় ক্ষমতা একবার ভাবুন। সময়কে একেবারে স্ট্যান্ড স্টিল করে রেখে দিয়েছে। কোন্ শতাব্দীতে পড়ে আছি, কার বাপের ক্ষমতা আছে বলুক তো!

এক্সের হঠাৎ জর্জ সিমেলের কথা মনে পড়ে গেল। দলের বাইরে লড়ার মতো কোনও একটা কিছু খাড়া করতে না পারলে দলে ভাঙন ধরে। শাসকদল সেই কারণে নিজের স্বার্থেই একটা জুজু তৈরি করেন। সেই জুজুর নাম প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত। ঠাকুর ঘরে ঘণ্টা নাড়ার মতো রোজ রাজপথে নেমে পড়, কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। বলো, শিয়রে শমন, সাবধান, যা চলছে চলতে দাও, যেমন চলছে চলতে দাও। শাসনের এর চেয়ে সোজা পথ আর কিছু নেই। মানুষের সব বায়না এক কথায় ঠাণ্ডা। কোসারও এই একই কায়দার কথা বলেছেন, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যুক্তদল দলের বাইরে যতক্ষণ না লড়াই করার মতো শত্রু তৈরি করতে পারছে, ততক্ষণ নিজেদের ঐক্য বজায় রাখতে কোপাবে। লুকিং আউট ফর একস্টারনাল এনিমিস, ইজ দেয়ার-ফোর এ কমান ফেনোমেনা।

গাড়ি অনেকটা পথ চলে এসেছে। এক্স জিজ্ঞেস করলেন, আর কত দূর?

শীলা বললে, এসে গেছি।

পথের পাশে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পড়ে আছে মাঝারি মাপের একটা লাইন।

মেয়ে, পুরুষ, শিশু। কারুর হাতে টিন, কারুর হাতে বোতল।

এটা কি তামাশা, শীলা?

তেলের লাইন। কেরোসিন তেল। ঘণ্টা চারেক দাঁড়াতে পারলে এক লিটার মিলতে পারে।

তেল তো গ্রামের জিনিস, শহরে তেল কি হবে?

গ্রাম এখন শহরে এসে গেছে। গ্রামের রাতে আর বাতি জ্বলে না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ট্রেনে চেপে রাতের দিকে শহর ছাড়লেই দেখবেন, থই থই করছে আদিম অন্ধকার। একটা দুটো আলোর

বিন্দু হঠাৎ ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে, ঘুমের দেশে সন্দেহবাদী রাতজাগা রুগীর মতো। ঘুম আসছে না, কিছুতেই ঘুম আসে না। খুনী লেডি ম্যাকবেথ, ফসলের মাঠে একা ঘুরছে হাতে রাজ-রক্ত। আদিম রাজার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে।

এখন তো যুদ্ধ চলছে না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো শেষ হয়েছে অনেকদিন। তৃতীয়ের প্রস্তুতি চলেছে। দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেই তেল পাওয়া যাবে না কেন?

ইল্লির চক্রান্ত। অ্যাকিউট ক্রাইসিস। ডবল দাম দিলে ব্যারেল ব্যারেল পাওয়া যাবে। ন্যায্য দামে পেতে হলে, সারা দিন লাইনে দাঁড়াতে হবে। জীবন গোলাপের বিছানা নয়, মিস্টার এক্স।

তোমাদের দেশের একটা রিপোর্টে পড়েছিলুম, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পেঁছে যাবে।

রিপোর্টে সামান্য ভুল ছিল। পাদটীকায় লেখা ছিল, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের খোঁটা যাবে আর এই মহানগর থেকে বিদ্যুৎ চলে যাবে। কল-কারখানায় জ্বলবে মোমবাতি। তাই হয়েছে।

আলকাতরা নগরীর শিক্ষিত মহল্লায় গাড়ি ঢুকল। সময়টা বিকেল বিকেল। একটা বেশ কৃত্রিম কৃত্রিম কালচারের গন্ধ বেরচ্ছে। না কাঙালী সভ্যতা, না আংলিশ। বিদেশী ম্যাগাজিন পড়ে সায়েব সাজার চেষ্টা। শুধু লুলু নয়, হনুলুলু। বিশাল বিশাল মহিলারা রাস্তা-ঝ্যাঁটান ম্যাকসি পরে ঘুরছে। কথাবার্তা কেমন যেন আদুরে আদুরে। ছেলেদের চেহারা অ্যাডোনিসের মতো। মাথার চারপাশ বেয়ে ঝুলছে চিকণ চিকণ চুলের গোছা। জামার বাহার দেখলে ল্যাটিন আমেরিকার কথা মনে পড়ে। ট্রাউজার আমেরিকার, জামা কামস্কাটকার, বিটলসদের মতো চুল।

এক্স জিজ্ঞেস করলেন, এঁরা কি করেন? এই সব ছেলেরা!

এঁদের আমরা আঁতেল বলি। সব বিষয়েই এঁদের অসাধারণ জ্ঞান। এঁরা ফিলম্ বোঝেন, ফাইটার প্লেন বোঝেন, ফুটবল জানেন, ফেলিনির শেষ ছবি কি তাও জানা আছে।

জীবিকা?

প্রেম করা।

সে আবার কি?

এ দেশে ফ্রী সেক্সের ঢেউ এসেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেক্স ইন দি ক্যাম্পাস চালু হয়েছে। মেয়েরা এখন ডেটিং, নেকিং এই সব শব্দ বলতে শুরু করেছে।

তুমি দেখছি গ্র্যানির মতো কথা বলছ! এ সব কি তুমি পছন্দ করো না?

আমার পছন্দ! আমি তো আউটসাইডার, ঘৃণ্য। প্রেমে গৌরব, পেশায় অগৌরব। প্রোফেসান্যাল খুনী ক্রিমিন্যাল, পলিটিক্যাল খুনী, নেতা, দাদা, আদরের নাম মাস্তান।

তুমি খুব সিনিক হয়ে গেছ শীলা।

বাড়িটা নতুন। দোতলার তিন লেখা ফ্ল্যাটের দরজায় শীলা টুক টুক করে দুবার শব্দ করল। চশমা পরা এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। চোখে চশমা, চুলে পাক ধরেছে। সাধারণ সাদা কাপড়, সাদা ব্লাউজ। সামান্য ময়লা ময়লা।

শীলা বললে, অমর আছে?

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে সরে গেলেন। এক্সের মনে হল, ইনিও একজন আউটসাইডার। নিজ ভূমে পরবাসী। ইনি যে সময়ের মানুষ, সেই সময়ের জীবনযাত্রার ধরণ ধারণ, বিশ্বাস অবিশ্বাস, ধর্ম অধর্ম, আদর্শ অনাদর্শ, আহার বিহার সবই বদলে গেছে। হাট ভেঙে যাবার পর, হাটে বসে থাকা একলা মানুষের মতো মুখ চোখের ভাব।

ভেতর থেকে বেশ ভারি গলায় প্রশ্ন ভেসে এলো, কে?

শীলা বললে, অমর, আমি।

ও, তুমি এসেছ, বলে অমর ভেতরের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। হাসি মুখে এক্সের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, আসুন আসুন।

ছেলেটিকে এক্সের বেশ ভালো লাগল। মিষ্টি, নরম মুখ। লম্বা চওড়া চেহারা। শীলা বলেছিল লোভী। চোখ দুটো কিন্তু লোভীর নয় শিল্পীর। বসার ঘরটি বেশ কায়দা করে সাজান। সোফা, সেন্টার টেবিল, এক চৌকো কার্পেট। অ্যাশট্রে। পালিশ করা দেওয়ালে ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারে বিমূর্ত চিত্রকলা। ঘর যত পরিপাটি, মন তত পরিপাটি নয়। অনিশ্চয়তার জমিতে আতঙ্কিত মানুষ। আজ গেলে কাল কি হবে জানা নেই। শিল্প সভ্যতার এই এক গুণ, মানুষের মন তুলে নেয়। মনহীন, মনন-হীন রোবট। অমরের ঘরে বসে এক্সের হঠাৎ গলব্রেথকে মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোক লিখছেন, যন্ত্রযুগের এই এক মজা, যখন ঠিক ঠিক চলে তখন সব ভালো। সকলেরই চাকরি-বাকরি আছে, রোজগারপাতি হচ্ছে। কিন্তু গড়বড় করলেই মহা সমস্যা। বেকার বাড়তে লাগল। দিনের পর দিন মানুষ বসে গেল ঘরে। প্রতিষ্ঠানের বাইরে ধর্মঘটকারীদের বিক্ষুব্ধ জমায়েত। চিৎকার, স্লোগান। পটভূমি কম্পমান। হঠাৎ যদি জানা যায়, যার ওপর বসে আছি সেটা একটা আগ্নেয়গিরি তা হলে মনের অবস্থা যা হওয়া উচিত এ দেশের মানুষের সেই অবস্থা। পালঙ্কে বোমা নিয়ে ফুলশয্যা।

অমর ব্যবসা করে। কিসের ব্যবসা বোঝা গেল না। কেনা আর বেচা। কখনও পকেট ভর্তি, কখনও পকেট খালি। দু মেরুতে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে অমর। অমর হল কনট্যাক্ট ম্যান। দেশের শিল্পপতি আর সরকারের ক্ষমতাশালী প্রভুদের মধ্যে একটা যোগ সেতু। অনেকটা দালালের মতো। এক ধরনের পিম্প। এই যোগাযোগে দু পক্ষই লাভবান। সেই লাভের গুড় অমর একটু পায়। বড় কষ্টের জীবন, বড় কষ্টের জীবিকা। শীলা অমরের ডান হাত। যেখানে অমর একা কায়দা করতে পারে না, সেখানে শীলা নেমে আসে বঁড়শির ঠোঁটে টোপের মতো। অনেক সময় ব্ল্যাকমেল করেও বাঁচতে হয়। শিল্পে, শিক্ষায়, রাজনীতিতে,

উচ্চপদে, সর্বত্রই লম্পট আছে। চরিত্র একস্ট্রা সেক্সের রাস্তায় চললে, কাজ আদায় করা অনেক সহজ হয়। আর যে একবার চারে ভিড়েছে তার সহজে পালাবার উপায় থাকে না। তখন তারা পি. জি উডহাউসের চরিত্র। রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক নজরে দেখে নাও, বেশ মালদার একজন কোথায় কোন্ কোণে বসে আছে। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলে যাও, আই নো ইওর সিক্রেট। এই কথাটি বলে সেই রেস্তোরাঁর কোনও এক কোণে তুমি গ্যাঁট হয়ে বসে মৃদু মৃদু হাসতে থাক। যাকে বলে এলে তার পান ভোজন মাথায় উঠল। সে মাঝে মাঝেই সন্দেহের চোখে তোমার দিকে তাকাতে থাকবে। এক সময় তাকে উঠে আসতে হবেই। তোমার উল্টো দিকে বসে সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করবে, কি জানেন? তোমার মুখে তখনও সেই মৃদু হাসিটি ঝুলছে। তুমি বলবে, প্রায় সব গোপন কথাই জানি। লোকটি তখন জিজ্ঞেস করবে, কি খাবেন বলুন।

ক্ষুদ্র মানুষের জীবনে তেমন গোপন কিছু থাকে না। বড় মানুষের জীবনে চেপে রাখার মতো অনেক কিছুই থাকে। সারা পৃথিবীই তো ব্ল্যাকমেল করে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বজায় রেখেছে। সব সম্পর্কই দাঁড়িয়ে আছে, এই কিছু না বলার আবেদন, কিছু না বলার প্রতিশ্রুতির ওপর।

শীলা বললে, আমি তাহলে চলি।

অমর বললে, আজই তো সেই বুড়োর দিন।

হ্যাঁ, সেই বুড়ো।

তিনটে নতুন টেলিফোন লাইনের কথা ভুলো না কিন্তু। টাকা খাইয়ে আর খেয়ে বসে আছি। কাল তোমার কি আছে?

এখনও কিছু নেই।

তাহলে আমি ঘটিওয়ালার সঙ্গে ফিক্সআপ করি। শেয়ালকে কনট্র্যাক্টটা পাইয়ে দিতে পারলে বেশ মোটা টাকা পাওয়া যাবে।

তাই করো।

শীলা চলে গেল। অমর হাসিমুখে এক্সকে বললে, কি খাবেন বলুন?

আমার এখানে সব ব্যবস্থাই আছে।

এক্স বললেন, এক গেলাস জল।

আর কিছু নয়? জাস্ট ওয়াটার?

আছি তো। পরে হবে!

এক কাপ চা?

আচ্ছা, চা এক কাপ।

অমর হাঁক মারল, মা।

নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়ালেন সেই প্রৌঢ়া মহিলা। যাঁকে দেখলেই মনে হয় বহু যুগের ওপার থেকে এপারে এসেছেন। ভদ্রমহিলা অতি শীতল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, বলো?

ভদ্রমহিলা কি যতখানি শীতল, অমর ঠিক ততটাই উত্তপ্ত? অমর বললে, ইনি আমাদের পেয়িংগেস্ট হয়ে কয়েকদিন থাকবেন। তুমি একটু দেখা শোনা কোরো। কোনও অসুবিধে যেন না হয়। এখন তুমি এঁকে এক কাপ চা করে দাও। সঙ্গে বিস্কুট দিও।

যেমন নীরবে এসেছিলেন, সেই ভাবেই তিনি চলে গেলেন।

এক্স বললেন, শুধু শুধু ওঁকে কষ্ট দিলেন। চায়ের কোনও প্রয়োজন ছিল না। ওঁর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এ বয়েসটা খাটার নয়, বিশ্রাম নেবার।

মায়ের বয়েস হয়েছে ঠিকই তবে অথর্ব হয়ে যান নি। আসলে ওঁর মনটা ভেঙে গেছে। তাহলে শুনুন, আমার বাবা ছিলেন একসাইজ ইনসপেক্টার।

অমর উঠে গিয়ে ওপাশের টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার এনে জাঁকিয়ে বসতে বসতে এক্সকে বললে, আপনি কমফর্টেব্‌লি বসুন না স্যার।

এক্স বললেন, আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বেশ আছি।

হ্যাঁ যা বলছিলুম, বাবা ছিলেন একসাইজ ইনসপেক্টার। বেশ বড় মাপের সাহসী মানুষ ছিলেন। ইউনিফর্ম পরে, কোমরের বেল্টে রিভলভার ঝুলিয়ে যখন বেরোতেন তখন কেমন যেন বিলিতি বিলিতি মনে হত। বাঙালী বলে মনেই হত না। একদিন, সে দিন ছুটির দিন। খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করছেন, ইনফর্মার এসে খবর দিলে, ডকে একদল স্মাগলার জাহাজ থেকে মাল

নামাচ্ছে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। মা বললে, আজ ছুটির দিন, আজ আর তোমাকে যেতে হবে না। বাবা বললেন, ওই দলটাকে আমি অনেকদিন হল কায়দা করার চেষ্টা করছি। তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি যাব আর আসব। বাবা বেরিয়ে যাবার পর আমাদের খেয়াল হল, রিভলভারটা ফেলে গেছেন। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র একজন মানুষ লড়তে গেছেন একদল ক্রিমিন্যালের সঙ্গে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে, উদাস মুখে অমর উপসংহারে এল, বাবা আর ফিরে এলেন না। ব্রুট্যালি মার্ডারড্। মর্গ থেকে যখন লাশ বেরিয়ে এল তখন মনে হল, মানুষ নয় বাঘে খুবলেছে। বয়েস তখন আমার মাত্র দশ। সেই দৃশ্য, বুঝলেন মিস্টার এক্স আমার মনে, মানুষ সম্পর্কে চিরকালের জন্যে একটা ধারণা তৈরি করে দিয়ে গেছে। মানুষ হল প্রকৃতির নিষ্ঠুরতম প্রাণী। এ ডেসপিকেবল বাইপেড অ্যানিমেল। 'টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগ আন্ডার দি সি'-র সেই ক্যাপটেনকে আপনার মনে আছে মিস্টার এক্স! সেই মনুষ্যবিদ্বেষী মানুষটি! নির্বিচারে জাহাজের তলা ফাঁসিয়ে ফাঁসিয়ে বেড়াত।

সিগারেটের টুকরো অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে অমর বললে, সাপের মতো আমার যদি বিষ দাঁত থাকত, তাহলে আমি মানুষকে নিঃশব্দে ছোবল মেরে মেরে, মানুষের ধর্ম আরও ভালোভাবে পালন করতুম।

তোমার ঈশ্বর? তোমার ঈশ্বর যে তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

ঈশ্বর! অমর লোহার মানুষের মতো হেসে উঠল। আজ পর্যন্ত মানুষ যে সব জিনিস বিশ্বাস করে এসেছে সবই হল ভাঁওতা। ফল্স। অ্যাবসলিউট লাইজ। দে আর মিয়ার ফ্যান্টাসিস, দে আর লাইজ, অল দি কন্সেপ্টস গড, সোল, ভারচু, সিন, বিঅন্ড ট্রুথ, ইটারন্যাল লাইজ। অসুস্থ, রুগ্ন, সুবিধেবাদী কিছু মানুষের ধাপ্পাবাজি।

অমরের মা চা নিয়ে এলেন। ছেলের জন্যেও এক কাপ এনেছেন।

অমর মায়ের হাত থেকে ট্রেটা নিতে নিতে বললে, মা, কত বছর হল তুমি হাসতে ভুলে গেছ? কত বছর হল?

মহিলা কোনও উত্তর দিলেন না। স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। দুটো চোখ যেন দুটো নিষ্কম্প প্রদীপ। তারপর যেমন এসেছিলেন সেই ভাবেই চলে গেলেন।

অমর বললে, নিন, চা খান। মৃত্যুকে আগের চেয়ে আমরা সহজ করে নিয়েছি।

এক্স চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, তারপর কি হল? আততায়ীরা ধরা পড়েছিল?

না, ধরা তো পড়লই না। উল্টে, কর্তৃপক্ষ স্থানীয়েরা বললেন, আকাট, গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকের ওই ভাবেই মরণ হয়। কর্তব্যের বাড়াবাড়ি। ধরে আনতে বললে, বেঁধে আনে। আমিও পারলুম না মিস্টার এক্স, মানুষ হতে পারলুম না।

কেন? এই তো বেশ হয়েছেন!

না না, কোথায় আর হয়েছি! এখনও পর্যন্ত একজনেরও জীবন নিতে পারলুম না। রক্তটাই দূষিত হয়ে গেছে। পরোপকারের হেমোগ্লোবিন, প্রেমের প্ল্যাটলেট শিরায় শিরায় ঘুরছে। শয়তানকে দেখতে পাচ্ছি, ধরতে পারছি না। মারতে গিয়ে মরে আসছি। হারাতে গিয়ে হেরে আসছি।

তোমার ওই শীলা!

শীলা! ওর মতো সৎ মেয়ে আপনি কজন পাবেন?

সৎ! সতের সংজ্ঞা কি তাহলে পালটে গেছে!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার কাছে পালটে গেছে। মানুষের মেকআপ সরিয়ে আসল মানুষ চিনে নেবার কায়দা আমি রপ্ত করে ফেলেছি। চারটে লাইন শুনবেন? গানের লাইন,

অগ্নি ঢাকা যৈছে ভস্মের ভিতর,
সুধা আছে তৈছে গরল ভিতর,
যে জন সুধার লোভে যেয়ে
মরে গরল খেয়ে
মথনের সুতার জানে না তারা॥

মথন মানে বুঝলেন মিস্টার এক্স? মথন মানে মন্থন, মানে 'চার্ন'। আরো চারটে লাইন শুনুন, যার কোনও তুলনা নেই।

যে স্তনের দুগ্ধ খায়রে শিশু ছেলে
জোঁকের মুখে তথায় রক্ত এসে খেলে,
ফকির লালন বলে, বিচার করিলে
কু-রসে সু-রস মিলে এই ধারা ॥

বুঝলেন কিছু, মিস্টার এক্স? শিশুর মুখে যে স্তন দুধ ঢালে, জোঁকের মুখে সেই স্তন রক্ত ঢালে। একই নারী কারুর কাছে কামদা, কারুর কাছে মোক্ষদা। ট্রুথ এক জিনিস, ফ্যানটাসি অফ ট্রুথ আর এক জিনিস।

এক্সের মনে হল, ছেলেটি বড় ইমোশানাল। জীবনের কথা, জীবনযন্ত্রণার কথা বলছে বটে, তাতে কিন্তু ঘৃণার চেয়ে ভালোবাসার ভাবই প্রবল। অনেক কিছু পেতে চেয়েছিল, সেই না পাওয়ার হতাশায় অভিমানী হয়ে উঠেছে। বাঁচারও একটা প্রোফেসানাল ধরন আছে। ইউরোপের লোক সেই ভাবে বাঁচতে শিখেছে। পৃথিবী যদি একটা মঞ্চ হয়, তাহলে ইউরোপীয়রা হল প্রোফেসানাল অ্যাকটার। জন্ম একটা জীবন ধর্ম। ইঁদুর জন্মাচ্ছে, ছুঁচো জন্মাচ্ছে, বেড়াল জন্মাচ্ছে, তেমনি মানুষও জন্মাচ্ছে। বেড়াল ইঁদুর মারছে, কুকুর বেড়াল মারছে, মানুষকে মানুষই মারছে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরে পশুর রূপ কল্পনা করা হয়েছে, বরাহ, নৃসিংহ। আসলে মানুষ হল বিভিন্ন পশু স্বভাবের তালগোল পাকান বিচিত্র এক রূপ। ইঁদুরের মতো মানুষ, ছুঁচোর মতো মানুষ, শূকরের মতো মানুষ, বাঘের মতো সিংহের মতো মানুষ। প্রবলে দুর্বলকে মারবে, সোজা নিয়ম। ও দেশে এই সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেউ প্যান প্যান করে না। খাটো, খাও, ফুর্তি করো, মারো কিম্বা মরে যাও। সে দেশে মানুষের অত ভাববার সময় নেই। সোজা থিওরি, ভোগ, রোগ, মৃত্যু।

এক্স বললেন, অমর তুমি গীতা পড়েছ?

শুনেছি। পড়ি নি। পড়ার সুযোগ হয় নি।

সময় পেলে পড়ে ফেলো। তোমার খুব উপকার হবে। ভাবাবেগ কমে যাবে। আরও বেশি প্রোফেসানাল হয়ে উঠতে পারবে। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের একটি অধ্যায় আছে। অর্জুন ভীষণ ইমোশানাল হয়ে পড়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, যুদ্ধ করার

সাহস পাচ্ছেন না, শ্রীকৃষ্ণ তখন হাঁ করে বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জুন দেখলেন সৃষ্টি মৃত্যুরই খেলা। পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, জীব জগতও তেমনি ছুটে চলেছে কালের মহাগহ্বরে আত্ম বিসর্জনে! নদীর জলরাশি যেমন সমুদ্রের দিকে ছোটে, অনন্ত জীব জগৎ তেমনি ছুটে চলেছে মৃত্যু পারাবারের দিকে।

এক্স কথা শেষ করেছেন কি করেন নি, অমরের মা ঘরে এলেন। এতক্ষণ যিনি কোনও কথা বলেন নি, তিনি হঠাৎ গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন ঃ

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভি মুখা প্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি ।।

এক্স ফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে চলেছেন। একবার দুবার তিন বার, বার বার। আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। অমর প্যান্ট ইস্ত্রি করতে করতে বললে, ওভাবে হবে না। নাইন নাইন ডায়াল করে অপারেটারকে বলুন। ধরে দেবে।

এক্স অপারেটারকে বিনীত ভাবে বললেন, আমাকে দয়া করে একটা লাইন ধরে দেবেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ম্যাডাম? বেজেই চলেছে, ধরছেন না।

সে কৈফিয়ত কি আপনাকে দিতে হবে?

তাহলে কাকে দেবেন ম্যাডাম?

অথরিটিকে।

তিনি কে ?

তিনি ইল্লিতে।

মহিলা পাশে সরে গেলেন। অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলছেন। এক্সের কানে বার কয়েক ফ্রায়েড রাইস শব্দটি ভেসে এলো। এক্স ক্রমান্বয়ে হ্যালো, হ্যালো করছেন।

অমর বললে, অত কথা বলতে গেলেন কেন ? এ দেশে কোনও কিছুর জন্যে কমপ্লেন চলে না। রেলের খাতা, ফোনের খাতা, পোস্টাপিসের খাতা, সব জায়গায় খাতা আপনি পাবেন। সাদা পাতা। কেউ আর কিছু লেখে না। পণ্ডশ্রম, সময় নষ্ট। মিষ্টি কথায় অথবা ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করতে হবে। দেখি, রিসিভারটা আমার হাতে দিন।

অমর কানে রিসিভার লাগিয়ে বকের ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খোঁচা-খুঁচিতে কাজ হবে না। মহিলা তাঁর পার্শ্ববর্তিনীকে ফ্রায়েড রাইস রান্না শেখাচ্ছেন। কতক্ষণ আর শেখাবেন ? ও পদ রান্নায় এমন কিছু ভজ-ঘট নেই। তবে এর পর যদি চৌমিন শুরু করেন, তা হলেই বিপদ।

অমর আস্তে একবার হ্যালো বলতেই মহিলা খ্যাঁক করে উঠলেন, হ্যালো।

দিদি দয়া করে একটা লাইন ধরে দেবেন ?

নম্বর বলুন ?

চার ছয়, ছয় চার, সাত দুই।

চার ছয় এক্সচেঞ্জ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সব ঝাড়বংশ উপড়ে ফেলে দিয়েছে, তিন মাসের আগে লাইন পাবেন বলে মনে হয় না।

সে কি ?

হ্যাঁ সে কি ? আপদ চুকিয়ে দিয়েছে।

এ সর্বনাশ কে করলে ডারলিং ?

এই মহানগরীতে এখন যে পারছে সেই খুঁড়ে চলেছে।

কেন মাই লাভ ?

কাগজ পড়েন না ?

আগে পড়তুম। এখন আর পড়ি না। খুন আর ডাকাতির খবর পড়তে ভালো লাগে না।

আরে মশাই সীতার পাতাল প্রবেশ যে এই শহরেই হয়েছিল। সেই স্পটটা খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে। পণ্ডিতদের ধারণা লিঙ্গুয়ামেন্টের কাছেই সীতার পাতাল প্রবেশ হয়েছিল। রাশিয়া থেকে লোক এসে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিয়েছে। গর্ত করতে করতে, এদিক থেকে ফুটো করে ওদিকে আমেরিকায় গিয়ে উঠবে। আর দু'দলে যদি মাঝ সুড়ঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যুদ্ধ ওইখানেই বেধে যাবে। পৃথিবী সবেদার মতো চার চাকলা হয়ে খুলে বেরিয়ে যাবে। না, আপনার সঙ্গে আর বকর বকর করতে পারছি না, আমার বোর্ড জ্বলে যাচ্ছে। অমর রিসিভার নামিয়ে রেখে এক্সকে বলল, নাঃ, আপনার লাইন আর পাওয়া যাবে না। শ' পাঁচেক লাইনের শেকড় উপড়ে তুলে ফেলে দিয়েছে।

কেন?

ওরা খবর পেয়েছে, এই শহরেই সীতার পাতাল প্রবেশ হয়েছিল। লিঙ্গুয়ামেন্টের কাছাকাছি কোন জায়গায়।

লিঙ্গুয়ামেন্ট কি জিনিস?

ওই যে শহরের কেন্দ্রস্থলে দেখবেন স্তম্ভের মতো খাড়া একটি বস্তু। এই শহরের পুরুষত্বের প্রতীক হয়ে নীল আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে আছে।

তুমি ইতিহাস জানো? ওটা কারা তৈরি করেছিল?

মনে হয় শৈবদের কাজ। এখানে শিবের চ্যালাদের যা উৎপাত। শহর সতীর ছিন্নদেহের মতো তাদের পায়ের তলায় পড়ে আছে। শ্রাবণ মাসে কাঁধে বাঁক নিয়ে ভক্তের দল কাতারে কাতারে ছুটছে বাবার মন্দিরের দিকে। আগে শুধু পুরুষরাই ছুটত। সিনেমা হবার পর এখন মেয়েরাও দৌড়চ্ছে, ভোলে বাবা পার করেগা, পাগলা বাবা পার করেগা। বাবার মাথায় জল ঢালার জন্যে সেচ বিভাগের লোক এসে তিনমাইল লম্বা নল বসিয়েছে। সেচের জলের মতো অঙ্গানদীর জল বইছে সেই চ্যানেলে। আজ জল ঢাললে বাবার মাথায় গিয়ে পড়বে কাল সকালে। ভি. আই. পি. ছাড়া বাবার মাথায় ডিরেক্ট কেউ জল ঢালতে পারে না।

শুনেছি বাঙলাদেশে নাকি এই রকম এক তীর্থ আছে, যার মোহন্ত এক কুলবধূকে···

হ্যাঁ, সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড করে ফেলেছিলেন, তাই নিয়ে বই, ছড়া, পটচিত্র, এক যুগ ধরে হই হই, রই রই কাণ্ড। সেই ট্র্যাডিসন এখনও চলছে। বাবার ভক্তরা কেউ কেউ ওখানে সেক্স করতে যান। নানা রকমের ব্যবস্থা আছে। ধর্মশালা আছে, ছিনতাই পার্টি আছে, গুণ্ডা আছে।

লাইনটা তাহলে সত্যিই পাওয়া যাবে না?

কোনো আশা নেই। উত্তর থেকে দক্ষিণে, কেন্দ্র থেকে পূর্বে একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়া হচ্ছে। সেই স্বদেশী যুগের গানের বিদেশী পরিণতি, 'চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই'। বিশাল বিশাল যন্ত্র এসেছে। দিন নেই রাত নেই খুঁড়েই চলেছে—ডিগ ডিগ ডিগ জাস্ট ফাইন্ড এ ক্যাচ বিগ। বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, মদ চাই, মেয়ে মানুষ চাই, ডিগ ডিগ ডিগ। গর্তে মানুষ পড়ছে ডিগবাজি খেয়ে, গাড়ি পড়ছে গোঁত্তা খেয়ে, ডিগ ডিগ ডিগ, নিড এ ক্যাচ এনাফ বিগ।

এক্স বললেন, তুমি আমাকে একটা জিনিস বুঝিয়ে দাও অমর, তোমরা সভ্যতার কোন স্তরে পড়ে আছ? তাহলে আমার একটু সুবিধে হবে। নিজেকে সেই ভাবে প্রস্তুত করতে পারবো।

বোঝানোর চেয়ে নিজে বুঝে নেওয়া ভালো। আছেন তো, ক'দিন থাকলেই বুঝবেন। এক সঙ্গে আপনার অনেক বিষয়ের জ্ঞান হবে। স্বাধীনতা কাকে বলে, জীবিকা কাকে বলে, রাজনীতি কি বস্তু, মানুষ কতটা দেবতা, কতটা পশু।

বেশ তাই হবে। তাই হোক! কিন্তু আমি যে একবার অধ্যাপক বি. বি. জি-র সঙ্গে দ্যাখা করতে চাই। ফোনে পেলে কাল গেলেও চলত। তোমার এখন কি খুব কাজ আছে?

না, এই প্যান্ট ইস্ত্রি ছাড়া এখন আর কোনও কাজ নেই। হয়ে গেলে নিয়ে যাব। আপনি রেডি হয়ে নিন।

মিনিট পনেরো পরে, এক্স আর অমর দু'জনেই পথে নেমে এলেন। রোদে চারপাশ ঝলমল করছে। অমর বললে, একটাই সমস্যা, আমরা যাবো কিসে। বাসে ট্রামে অসম্ভব ব্যাপার!

ট্যাকসি এখন সব শাট্‌ল হয়ে অফিস পাড়ার দিকে ছুটছে।

এক্‌স বললেন, লেট আস ওয়াক। মধ্যযুগে মানুষ পায়ে হেঁটে ঘোরাফেরা করত। পয়সাঅলা লোক ঘোড়ায় চড়ত, গাধায় চড়ত। দিস ইজ মডার্ন এজ। স্বাধীন গণতন্ত্র। ইচ্ছে নয়, সঙ্গতি নয়, মানুষের মর্জির ওপর নির্ভর করে চলতে হবে। ক্ষমতায় যাঁরা আছেন. তাঁরা যে ভাবে চালাবেন সেই-ভাবে চলতে হবে। হামাগুড়ি দিতে বললে তাই দিতে হবে। তাই না?

ঠিক তাই।

তাহলে দুঃখ করে লাভ নেই। লেটস্‌ ওয়াক। তোমাকে অ্যালবার কামুর একটা উক্তি শোনাই। বড় সুন্দর তবে একটু অশ্লীল। তুমি কিছু মনে করবে না তো?

মনে করব কেন? সভ্য মানুষই তো সবচেয়ে বেশী অশ্লীল। সিভিলাইজেসানের অন্য নাম ভালগারিটি।

বাঃ তোমার সঙ্গে আমার মিলবে ভালো। তা হলে শোনো। কামু বলছেন সভ্য মানুষের নিয়তি হল, বউকে খাটে শুইয়ে রেখে নিজে মাটিতে শুয়ে মাস্টারবেট করা। তোমার সব থাকবে, ইউ উইল হ্যাভ এভরি থিং; কিন্তু অ্যাকসেস থাকবে না। সাম হাউ অর আদার তুমি ডিপ্রাইভড হবে। প্রাচুর্যে বসে মানুষ অনাহারে মরছে। হাসপাতাল থাকবে. ওষুধ থাকবে, ডাক্তার থাকবে. মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরবে। আইন শৃঙ্খলার প্রভুরা থাকবে, তবু মিনিটে একটা করে মানুষ খুন হবে। সেকেন্ডে একটা করে ধর্ষণ হবে, দিনে একটা কি দুটো ডাকাতি হবে বড় ধরনের। এ শুধু তোমাদের নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের এই হয়েছে ভাগ্যের লেখা। কম আর বেশি। জগৎ জুড়ে মানুষ এখন সভ্যবর্বর।

কথা বলতে বলতে দু'জনে হাঁটছে।

এদিকে বেশ পয়সাঅলা কাঙালীরা বড় বড় বাড়ি হাঁকিয়েছে। ব্যাঙ্কের টাকায় লম্বা লম্বা ফ্ল্যাট আকাশের দিকে মাথা ঠেলছে। এক একটা খাঁচা আড়াই, তিন, চার লাখ টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে। গ্যারেজ আছে. গাড়ি আছে। কাঙালীরা এখন ব্যবসা-ট্যবসা বুঝতে শিখেছে। চাকরেরা মোটা মোটা টাকা ঘুষ নিতে শিখেছে।

দূরে একটা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। ওপরে চলে গাড়ি আর মানুষ। নিচে রেল লাইন। পেছন থেকে গোটা তিনেক ট্যাক্সি আসছে। হর্ন শুনে, দু'জনে একপাশে সরে দাঁড়াল। গাড়ির ভেতরে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী।

এক্স জিজ্ঞেস করলেন, এদিকে কোনও আশ্রম আছে নাকি?

হ্যাঁ আছে ব্রিজ পেরলেই!

পর পর গোটা তিনেক গাড়ি ব্রিজের ওপর উঠে নিচের দিকে নেমে গেল। দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

এক্স বললেন, তোমাদের দেশে এখনও বেশ ধর্ম আছে!

তা আছে, তবে ধার্মিক নেই।

তার মানে?

মানে কেউ কারুর ধর্ম পালন করে না। যেমন তরলের ধর্ম গড়িয়ে চলা। তরল গড়ায় না, গ্যাস ওড়ে না, বুদবুদ ফাটে না, আলো অন্ধকার দূর করে না। ধর্ম এখানে দোকানের সাজানো জানালার মতো।

বুঝেছি। তুমি স্বভাবধর্মের কথা বলছ। কিছু করার নেই। তোমাদের প্রাচ্য ঋষিরাই তো বলে গেছেন, কলির শেষপাদে এই সব লক্ষণই দেখা যাবে।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের মাঝামাঝি এসেছে। এক্সের হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে। গরম থাকলেও তেমন অসহ্য নয়। হঠাৎ দেখা গেল উলটো দিক থেকে একদল লোক ছুটে আসছে। মুখে বলছে—পালাও পালাও।

গাড়ির গতি সব স্থির হয়ে আসছে। কিছু গাড়ি উলটো দিক থেকে ছুটে আসছে পাগলের মতো। অমর আর এক্স ব্রিজের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে না, সামনে এগনো উচিত হবে না পলায়মানদের সঙ্গে ছুটে পালাবে? অমর একজনকে ধরে ফেলল:

কি হয়েছে দাদা?

সে আমি বলতে পারব না।

তাহলে ছুটছেন কেন?

সবাই বলছে পালাও, তাই পালাচ্ছি।

অমরের হাত ছেড়ে লোকটি আবার ছুটতে শুরু করল।

এক্স বললেন, চল না এগিয়েই দেখি কি হয়। তেমন বুঝলে পালাতে কতক্ষণ।

আবার দু'জনে এগোতে লাগল। অধিকাংশ গাড়িই হয় সামনে না হয় পেছন দিকে পালিয়েছে। ব্রিজ একেবারে ফাঁকা। দূরে যে সব বাড়ি দেখা যাচ্ছে তার ছাদে, বারান্দায় জানালায় জানলায় কৌতূহলী স্ত্রী পুরুষ। একটু কিছু ঘটছে। কোনও সন্দেহ নেই।

এক্স বললেন, তেমন কিছু হলে, মানুষ দেখছে অথচ বাধা দিচ্ছে না কেন?

বাধা? কাঙালীরা আজকাল কোনও কিছুকেই বাধা দেয় না। তারা এখন দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। এ তাদের অনেক দিনের মজ্জাগত অভ্যাস। স্বদেশী যুগেও কাঙালীরা দর্শক ছিল। দেশ যখন আংলিশরা দখল করে নিচ্ছে তখনও তারা দর্শক ছিল। এ ব্যাপারে বাঙালীর সঙ্গে কাঙালীর কোনও তফাৎ নেই। ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে জিতে গোটাকতক ইংরেজ সৈন্য আর গোটা চারেক তোপ নিয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকলেন। বিজয়ী ক্লাইভ। ক্লাইভ সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লিখছেন: কী আশ্চর্য দৃশ্য! রাস্তার দুধারে, বাড়ির ছাদে, জানালায় অজস্র নারী পুরুষ। তারা আমাদের দেখছে। প্রত্যেকে যদি একটা করে ইট তুলে নিয়েও মারত, আমাদের হেরে ভূত হয়ে যেতে হত। বিচিত্র দেশ! তারা সব নীরব দর্শক হয়েই রইল। ইংরেজ প্রায় বিনাযুদ্ধে হাসতে হাসতে ভারত ভূখণ্ড গ্রাস করে নিল। আমাদেরও সেই একই অবস্থা মিস্টার এক্স।

ব্রিজের শেষ মাথায় এসে তাদের গতি আটকে গেল। একটি ছেলে এগিয়ে এসে অমরকে প্রায় ধমকের সুরে বললে, যাচ্ছিস কোথায়?

ছেলেটির চেহারা দেখার মতো। কালি মেখে মুখের চেহারা ঢেকেছে। গেঞ্জিতে রক্তের স্প্রে। হাতে পোড়া কালি, রক্ত। পেট্রলের গন্ধ বেরুচ্ছে। অমর বললে, এক ভদ্রলোকের বাড়ি যাব বলে বেরিয়েছি।

ফিরে যা, এক্ষুনি ফিরে যা।

তোরা কি করছিস?

কি করছি রাতের খবরে জানতে পারবি।

দূর থেকে একটা শিসের শব্দ ভেসে এলো। সঙ্গে হুঁসিয়ারী।

জিরো জিরো সেভেন ফিনিস করে দে। তোর দিকে ভাগছে।

গাড়িতে দেখা সেই সন্ন্যাসিনীদের একজন প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় ছুটে আসছেন। মাথাটা প্রায় থেঁতো হয়ে গেছে। বয়েসে তরুণী। আর্ত স্বরে চিৎকার করছেন আর বলছেন:

আমাকে আপনারা মারছেন কেন? আমাকে আপনারা মারছেন কেন?

অমরের পরিচিত সেই যুবক ছুটন্ত দিশেহারা সেই মহিলার দিকে খুচ্ করে একটি পা বাড়িয়ে দিল। মহিলা ছিটকে পড়ে গেল। ছুটে আসছে তিন চারজন বন্য বর্বর চেহারার মানুষ। কারুর হাতে ইট, কারুর হাতে পাথর খণ্ড, লোহার রড্, কংক্রিট স্ল্যাবের ভাঙা টুকরো।

উন্মত্তের মতো সকলে চিৎকার করছে—মার, মার।

এক্স ছুটে যাচ্ছিলেন বাধা দিতে। অমর দু'হাতে সেই বিদেশীকে জাপটে ধরল।

খবরদার না। ডোন্ট ট্রাই। আপনি সহ্য করতে না পারলে চোখ বুজিয়ে ফেলুন। করুণ চিৎকারে বাতাস বিদীর্ণ হয়ে গেল। অমর ঠিক এই ধরনের চিৎকার পাঁঠার দোকানে মাংস কিনতে গিয়ে মাঝে মাঝে শুনে আসে। দাঁড়ান বাবু, টাটকা মাল কাটা হচ্ছে। আগলি রাং 'ক' কিলো? অমর হয় তো বললে, এক কিলো। আর তখনই ভেতরে ঝড়াং করে একটা শব্দের সঙ্গে পাঁঠার শেষ আর্তনাদ! সে যে কী ভয়ঙ্কর! অমর মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মধ্যে মাছ খায়, মায়ের অনুরোধে। তিনি বলেন, মাছ মাংস ডিম একেবারে ছেড়ে দিলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

এক্সকে সত্যিই চোখ বোজাতে হল। জীবনে অনেক হত্যাকাণ্ড তিনি দেখেছেন। অনেক টর্চার দেখেছেন। আফ্রিকায়, আরবে, ল্যাটিন আমেরিকায়, নিজের দেশে। ফাঁসী দেখেছেন, ছুরি কিম্বা গুলিতে মানুষকে মরতে দেখেছেন, অ্যাসাসিনেসান দেখেছেন।

গ্রেনেডে প্রেক্ষা-গৃহ উড়ে যেতে দেখেছেন, মলোটভ ককটেলে আরোহীসহ গাড়ি পুড়ে ছাই হতে দেখেছেন। আততায়ীর গাড়ি অসতর্ক প্রতিদ্বন্দ্বীকে চাকায় পিশে পেস্টবোর্ড করে দিয়ে গেছে। তিনি অনেক দেখেছেন। এমন দৃশ্য কখনও দেখেন নি। বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ, ইট দিয়ে, পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে থেঁতো করছে এক নারীকে। শুধু থেঁতো নয়, খাবলে তুলে নিচ্ছে চোখ, কান নাক কেটে নিচ্ছে। তখনও সম্পূর্ণ মৃত নয়। প্রাণ রয়েছে। তারপর পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়ে অপরাধের চিহ্ন লোপ করার চেষ্টা।

এক্স কেমন যেন হয়ে গেলেন। অমর তাঁকে ধরে ধরে কাছাকাছি চেনা এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিল। এখন আর কোনও দিকেই যাওয়াটা নিরাপদ হবে না। অমরের এই বন্ধুটি ডাক্তার। বাড়ির বাইরেই চেম্বার। চেম্বারের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। রুগিরা ভেতরে আটক হয়ে পড়েছেন। বাইরে তাণ্ডব চলেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ আসছে। আগুনের হলকা আসছে। এদিক ওদিক ছোটাছুটির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

এক্স নিজের ইলেকট্রনিক ঘড়ির দিকে তাকালেন।

ঊনিশশো বিরাশী সাল! মাস, তারিখ সময় সবই তো চলে এসেছে বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে। তাহলে! ঘড়ি ঠিক চলছে তো! মধ্যযুগের মানুষ এইভাবে ডাইনী হত্যা করত। প্রস্তর যুগের ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। অসভ্য মানুষ দাঁড়িয়ে আছে গুহার সামনে। পরিধানে পশুচর্ম। সামনে কুঁজো হয়ে আছে। হাতের আর পায়ের আঙুলে হত বড় বড় নখ। জট-পাকান চুল। শরীরে বড় বড় লোম। সামনে বড় বড় দুটো দাঁত। যে দাঁত ঝলসানো পশুর মাংস ছিঁড়ে খায়। হাতে একটা পাথুরে অস্ত্র।

বাইরে ওরা কারা? কারা ছুটছে?

ডাক্তার বললেন, শিগগির একটু কেরোসিন, কেরেসিন।
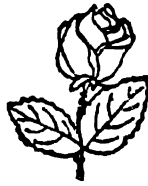
একুস সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এ দেশে আসার আগে তিনি থাইল্যান্ড, ভারতের বুদ্ধগয়া, লুম্বিনী, বারাণসী প্রভৃতি জায়গা ঘুরতে ঘুরতে এসেছেন। প্রাচ্য মানেই শান্ত জীবন, উচ্চ চিন্তা, অহিংসা এইসব শুনে এসেছেন। আড়তর্ষের প্রতিবেশী দেশ ভারতবর্ষে এক মহাপুরুষ এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। অহিংস আন্দোলনে অত বড় একটা দেশকে স্বাধীন করে দিলেন। অনশনই ছিল তাঁর অস্ত্র। একুসের ধারণাই ছিল না প্রদীপের তলাতেই থাকতে পারে অন্ধকার। অত শান্ত, অত উন্নত, অত ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের কোনও প্রভাবই পড়ে নি আড়তর্ষে। যদি পড়ত তাহলে মানুষ মানুষকে এইভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করতে পারত না। অপরাধ, অপরাধী সব দেশেই আছে। বেশি আর কম। তা বলে পৃথিবীতে আজ আর এমন কোনও সভ্য দেশ নেই, যে দেশের মানুষ যে কোনও ছুতোয়, যে কোনও ভাবে গণ-হত্যাকে এমন দাবি হিসেবে জন-জীবনের ওপর অক্লেশে চাপিয়ে দিতে পেরেছে। বিদেশে যেমন বলে, ফ্রীডম ইজ আওয়ার বার্থরাইট, এরা তেমনি বলছে, ফ্রীডম টু কিল ইজ আওয়ার ন্যাশনাল রাইট। আমরা মারবো। রোজ আমরা মারবো, যে ভাবে খুশি মারবো।

একুস শুয়ে আছেন একটা ইজিচেয়ারে। প্রচণ্ড স্নায়বিক উত্তেজনার পর একটা শিথিলতা এসে গেছে। অমর কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গেছে। বাড়িতে একুস আর অমরের মা। অমরের মা বিশেষ কথা-টথা বলতে ভালোবাসেন না। গুম হয়ে বসে থাকেন। গুনগুন করে সময় সময় গান করেন। আর তা না হলে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েন।

অমরের মায়ের এখন নিদ্রিত অবস্থা। এক্সের একা একা বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। উঠে গিয়ে টেলিভিসন খুললেন। ইজিচেয়ারটাকে একটু কোণের দিকে টেনে এনে বসে বসে অনুষ্ঠান দেখতে লাগলেন। ভক্তিমতী একজন মহিলা সংগীত সহযোগে ধর্ম আলোচনা করছেন। কণ্ঠে আবেগ, উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা, ভক্তিরস। চোখ সময় সময় ছলছলে। স্তোত্রপাঠের সুরটি এক্সের ভীষণ ভালো লাগছে। শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি হচ্ছে ঃ

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েইস্মদীয়।
সত্যং বদামি চ ভবান খিলান্তরাত্মা :
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে।
কামাদি দোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥

রাম শব্দটি এক্সের চেনা। ভারতের মহাত্মা গান্ধী যেখানেই যেতেন সেইখানে প্রার্থনা সভা শুরু হত, শ্রীরামের বন্দনা দিয়ে 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম'। আততায়ীর গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যাবার সময় একটি বাক্যই উচ্চারণ করেছিলেন, হায় রাম। ভারতের মানুষ এখনও রামরাজত্বের স্বপ্ন দেখেন। নিজের অজান্তেই এক্সের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, হায় রাম। মনে বেশ এক ধরনের শান্তি পেলেন। এ দেশেও তা হলে রাম এসেছেন। নামে এসেছেন, কামে আসেন নি। খবর শুরু হল।

নিউজ রিডার হেডলাইনস বলে শুরু করলেন। সবই প্রায় হৃদয়-বিদারক সংবাদ। তিনজন কলেজের ছেলে একজন নার্সকে ধর্ষণ করে তাকে হত্যা করেছে প্রমাণ লোপের জন্যে অ্যাসিড দিয়ে মুখ চোখ সব গলিয়ে দিয়েছে। জয় রাম, রঘুপতি রাঘব রাজারাম। সবকো সম্মতি দে ভগবান।

এক্স মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী পড়েছেন—মাই এক্স-পেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ। মনে পড়ছে কতক লাইন : The seeker after truth should be humbler than the dust. The world crushes the dust under its feet, but the seeker after truth should so humble himself than even the dust could crush him. গান্ধীজী জীবনী শেষ করছেন এই বলে, Ahinsa is the furthest limit of humility. সারা

বিশেব অহিংসা কোথায়! এক্স সোজা হয়ে বসলেন। সংবাদ পাঠক বলছেন, আজ এক তাণ্ডবে ষাট জন প্রাণ হারিয়েছেন। এঁরা সকলেই ছিলেন একটি ধর্মীয় সংগঠনের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী। আজ ছিল প্রতিষ্ঠানটির সম্মেলনী দিবস। এই হত্যাকাণ্ড কাদের দ্বারা সংগঠিত হল এখনও জানা যায় নি। উদ্দেশ্যও স্পষ্ট নয়। ঘটনার নারকীয়তায় শহরবাসী স্তম্ভিত।

অমর আর এক্স যা দেখেন নি, টিভির পর্দায় একে একে সেই সব দৃশ্য ভেসে উঠল। রক্তমাখা পরিধেয় বস্ত্র, পাদুকা, ঝোলা-ঝুলি, বই। ক্ষত বিক্ষত, থ্যাঁতলানো বিকৃত মৃতদেহ। পোড়া ছাই, দেহাবশেষ, ঝুল কালো হাড়ের টুকরো।

এক্স ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললেন। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না। মানুষ আসবে যাবে, এই তো জগতের নিয়ম। মৃত্যু এত কুৎসিত হলে সহ্য করা যায় না। ফাঁসি, তারও একটা পরিচ্ছন্নতা আছে। ফায়ারিং স্কোয়াড, আরও উন্নত পদ্ধতি, আমেরিকার বৈদ্যুতিক চেয়ার অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। আইখম্যানের গ্যাস চেম্বার গণহত্যার শ্রেষ্ঠ, সুপরিকল্পিত পদ্ধতি। কিন্তু সভ্যতা যত এগোচ্ছে মানুষ যেন ততই নৃশংস হয়ে উঠছে। জীবজগতে মানুষের চেয়ে নিষ্ঠুর প্রাণী এখন আর কি আছে। বাঘ মানুষ মারে কারণে, সাপ ছোবল মারে কারণে। মানুষ মানুষ মারে কখনও অকারণে, কখনও নিজেদের নীচ স্বার্থের কারণে। টিভির পর্দায় জনৈক সাংবাদিক গণ্যমান্য একজন নেতার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন।

সাংবাদিক ঃ আজ শহরের বুকে যে নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল, এই ঘটনায় আপনাদের শাসকদলের ভাবমূর্তি অনেকটা নষ্ট হল কি?

নেতা ঃ আমি তা মনে করি না।

সাংবাদিক ঃ কেন করেন না?

নেতা ঃ আজকাল কোনও দলের ইমেজ অত সহজে নষ্ট হয় না। বুদ্ধিমান ভোটদাতাদের আমরা এত সমস্যা দিয়ে রেখেছি, তাদের জীবন এখন শজারুর মতো। নিজেদের কাঁটা তোলায় ব্যতিব্যস্ত। এ সব বিচ্ছিন্ন ঘটনার সঙ্গে তাদের জীবনের তেমন কোনও যোগ নেই।

সাংবাদিক : এ এক ধরনের আত্মসন্তুষ্টি, তাই না ?

নেতা : আপনারা খবরের ব্যবসা করেন, মানুষের কি জানেন ? মানুষকে আমরা মানুষের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছি. কেউ আর সহজে বাইরে আসতে পারছে না। দেশের জন্যে, দশের জন্যে নয়, নিজের জন্যে বাঁচো। এ যুগের নীতি-শিক্ষা হল, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িও না।

সাংবাদিক : তাই যদি হয়, তা হলে আজ এরা কারা, যারা এতগুলো মানুষকে থেঁতো করে পুড়িয়ে মেরে ফেলল ?

নেতা : আমি জানি না। এ নিয়ে মাথা ঘামাবারও কিছু নেই। শিগগির আমরা চীনের কায়দায় দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার ফেলব, জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে।

সাংবাদিক : তাতে কি হবে ?

নেতা : তাতে এই হবে, মানুষ হাসতে হাসতে মৃত্যুকে মহামূল্য উপহারের মতো বরণ করে নিতে শিখবে। তখন ঘরে ঘরে মানুষ জন্মালে যেমন শাঁখ বাজে সেই রকম মরলেও শাঁখ বাজবে। মানুষ নেচে নেচে বলবে, যাক বাবা, আপদ গেছে, বাঁচা গেছে। মানুষ তখন আনন্দ-সংবাদের মতো, মৃত্যু-সংবাদ পরিবেশন করবে —হে হে কি আনন্দ, কাল আমার বাপ পটল তুলেছে, হে হে, কাল আমার মা অক্কা পেয়েছে, হে হে, কাল আমার রোজগেরে বড় ছেলেটার গলাটা কেটে নর্দমায় ফেলে রেখে গেছে। কী নিট কাজ মশাই ! জাস্ট একটা ব্লেড, একটা ব্লেডে অত দিনের একটা প্রাণ ফুস হয়ে গেল। আর একটা পোস্টারও দেয়ালে দেখা যাবে, যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।

সাংবাদিক : এর মানে ?

নেতা : ভেরি সিম্পল। এটা হল ডাকাতি, ছিনতাই আর লুঠতরাজের স্বপক্ষে জনমত তৈরির চেষ্টা। যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, প্রতিবেশী দেশ ভারতের দিকে তাকান, পরিসংখ্যান নাড়াচাড়া করলে আপনারা এত উত্তেজিত হতেন না। মনুর নাম শুনেছেন ?

সাংবাদিক : শুনেছি।

নেতা : তাঁর ভার্ডিক্ট কি ছিল জানেন ? ধান চুরি, পশু

চুরি, লোহা কিম্বা তামা চুরি, মাতাল মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার, বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, অথবা কোনও রমণী কিম্বা বিধর্মীকে হত্যা কোনও গুরুতর অপরাধ নয়। নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। মনু থেকে মানুষ, আপনারা কি সেই মনুকে ফেলে দিতে বলছেন ?

সাংবাদিক ঃ ভারতীয় ঋষিরা তো আরও অনেক কথা বলে গেছেন, সে সব কথা কি আপনারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন ?

নেতা ঃ দাঁড়ান মশাই, আগে একটা দিক হোক, সব দিক এক-সঙ্গে সামলান যাবে ? এত বড় দেশ ! এখানকার পার্কের একটাও রেলিং খুঁজে পাবেন ? বলুন, চোখে পড়ে ?

সাংবাদিক ঃ না।

নেতা : সব চুরি। এমন কি আমাদের রেড বিল্ডিংয়ের ছাদের বাহারী রেলিং পর্যন্ত আমরা চুরি হয়ে যেতে দিয়ে বাইবেলের নির্দেশ পালন করেছি—চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। যেখানে যে শাস্ত্রে যত ভালো ভালো নির্দেশ আছে, সব আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের উদারতাটা একবার দেখুন ! রাস্তার কলে একটাও পেতল কি লোহার মুখ পাবেন ? ম্যানহোলের ঢাকা পাবেন ? বলুন পাবেন ?

সাংবাদিক ঃ না।

নেতা ঃ তা হলে ? না দেখেই সমালোচনা করা একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনাদের ! ভালো কিছু চোখে পড়ে না ?

সাংবাদিক ঃ এও ভালো ?

নেতা ঃ ভালো নয় ? মনুর নির্দেশে আমরা চলেছি। এ সব হল পেটি অফেন্স। আমরা এক জনকেও ধরেছি ? একটাও ওয়াগন ব্রেকারকে আমরা ধরেছি ? ধরলেও ভুল বুঝে সঙ্গে সঙ্গে চা কফি খাইয়ে, সরি বলে, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই যে নার্স ধর্ষণ, অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে মারার কেস, একজনকেও আমরা কি ফাঁসিতে লটকাব ?

সাংবাদিক ঃ কেন ?

নেতা ঃ কিস্যু লেখাপড়া না করেই সাংবাদিক হয়ে বসে আছেন। গৌতম সংহিতা পড়েছেন ? আপনি যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি পড়েছেন ! কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়েছেন ?

সাংবাদিক ঃ পড়লে কি হত ?

নেতা ঃ পড়লে জানতে পারতেন, গোতম বলেছেন, মানুষ কেন মানুষকে মারে ! কেন মারবে যুগে যুগে ? মারবে ঐশ্বর্যের লোভে, ভালো খাবার, শোবার, ভোগের লোভে। অন্যের সুন্দরী স্ত্রীর আকর্ষণে কামচঞ্চল হয়ে আঁচল ধরে টানাটানি করবে। না পেলেই মারবে। যাজ্ঞবল্ক্যও একই কথা বলছেন। তা হলে ?

সাংবাদিক ঃ তাঁরা অপরাধের কারণ নির্দেশ করেছেন, অপরাধ করতে বলেন নি।

নেতা ঃ ধ্যার মশাই। কিস্যু বোঝেন না। কারণ না সরলে কার্য সরবে ! সবাই যদি উলঙ্গ হয়ে ঘোরে, ছিনতাই কি রাহাজানি হবে ?

সাংবাদিক ঃ না।

নেতা ঃ তা হলে ঘুরছে না কেন ? ব্যাঙ্কে টাকা না রাখলে ডাকাতি হবে ?

সাংবাদিক ঃ না।

নেতা ঃ তা হলে রেখে মরে কেন ? সেভিংস সেভিংস বলে চিল্লিয়ে মরে কেন ? টাকা কি মশাই জমিয়ে রাখার জিনিস ! টাকা উড়বে, টাকা ঘুরবে, টাকা সাদা হবে, কালো হবে। লিখুন না মশাই। হাতে কলম ধরেছেন যখন, জনমত তৈরি করুন। শুধুই সমালোচনা, শুধুই খুঁত বের করা, ইয়েলো জার্নালিজম ছেড়ে, হোয়াইটে আসুন।

সাংবাদিক ঃ আজকের হৃদয়-বিদারক ঘটনা থেকে আপনারা কি কোনও শিক্ষা পেলেন ?

নেতা ঃ অবশ্যই, অবশ্যই। প্রথম শিক্ষা, প্রস্তর যুগের মানুষ, প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র নিয়ে কি ভাবে বেঁচে ছিলেন বোঝা গেল। আমরা এখন দেয়াল লিখনে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারি ঃ Brick and stones are mighter than pipe guns and revolvers. একটা বুলেটের দাম ছত্রিশ টাকা, এক টুকরো পাথর কি ইঁটের দাম কিছুই না। সব কিছুরই একটা ইকনমি আছে মশাই। মার্কিনীরা একটা মানুষ মারতে পাঁচশো, পাঁচহাজার, পাঁচলাখ খরচ করতে পারে। দে হ্যাভ মানি। আমাদের মশাই গরিব দেশ। আমাদের ভেবে

চিন্তে কাজ করতে হবে। দেশের মানুষ যে ভাবতে শিখেছে, ইকনমিক হতে শিখেছে, আজকের ঘটনা তারই প্রমাণ। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই নেতাকে, সেই নেতৃত্বকে যাঁর ফুলপ্রুফ প্ল্যানে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। দ্বিতীয় শিক্ষা, নিরস্ত্র মানুষকে সশস্ত্র মানুষ অনেক সহজে মারতে পারে। তার মানে, একদল ভাড়াটে গুণ্ডাকে হাতে রাখতে পারলে গদি চালানো খুব সহজ কাজ। ধরো আর মারো। দেশের লোক ভয়ে তালপাতার মতো কাঁপতে থাকুক। পটকা ফাটলে কুকুর যেমন ভয়ে কুঁই কুঁই করে সেই রকম কুঁই কুঁই করুক। আমরা তখন সেরেফ ফাঁকা আওয়াজ করে রাজ্য চালাবো।

সাংবাদিক ঃ এই রকম একটা জঘন্য ঘটনা ঘটে গেল, আপনারা লজ্জিত নন ?

নেতা ঃ লজ্জিত ? লজ্জিত হতে যাবো কোন্ দুঃখে ? আমাদের পাশেই একটা দেশ আছে, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই বাংলা দেশ। সেই বাংলা দেশের মহাপুরুষ বলে গেছেন, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়। সে মহাপুরুষকে অবশ্য আমরা মানি না, আমাদের মহাপুরুষ থাকেন বিদেশে, হাউয়েভার, এই একটা নির্দেশ আমরা না জেনেই মেনে চলি। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বলি, মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ।

সাংবাদিক ঃ আর একটা প্রশ্ন ?

নেতা ঃ আর না ! কেন সময় নষ্ট করছেন ?

সাংবাদিক ঃ এখনও হাতে যে সময় রয়েছে, প্রোগ্রাম শেষ হয় নি !

নেতা ঃ ও বাজনা বাজিয়ে, ফিলার দিয়ে শেষ করে দেবে। দাঁড়ান দর্শকদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসি। চোখে চোখে হাসি।

দু'জনে উজবুকের মতো কিছুক্ষণ পর্দায় রইলেন, তারপর টপ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 'মেন অ্যাট ওয়ার্ক' পর্দায় ভেসে উঠল। স্টিল লাইফ।

এক্স ভাবলেন, এ আবার কি অনুষ্ঠান ! অনড়, ঝাপসা ছবি। একজন হাতুড়ি মারছে। একজন নাট-বল্টুতে টাইট মারছে। মিনিট

তিনেক ওই জিনিস চলল। তারপর মুখ গোমড়া করে একজন ঘোষণা করলেন, কবিতা পাঠের আসর।

সার সার কবি বসে আছেন। বিচিত্র সব চেহারা, বিচিত্র সাজ পোশাক। বেশ বড় সাইজের একজন কবি, চোখ ঢুলুঢুলু করে, মুখ আকাশের দিকে তুলে বলতে লাগলেন, শহরে আজ যে ঘটনা ঘটে গেল, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কবি মানসের প্রতিক্রিয়া আজকের আসরের ভাব বস্তু। কবির এক স্বতন্ত্র জীব। মানুষের মতো দেখতে হলেও তারা মানুষ নয়। কবি মানস, কবি কল্পনা কাল থেকে কালান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে পরিবাহিত হয়। হাসে, কাঁদে, ক্রোধে ফেটে পড়ে, দ্যায়লা করে। কবিরা সাধারণ মানুষ নয়। তারা অরণ্যচারী, গহনগামী, খেচর, ভূচর, জলচর প্রাণী। প্রথমেই কবিতা পড়বেন, কবি বনমর্মর বনস্থলী, সংক্ষেপে বর। আসুন কবিবর, হৃদয় দ্বার উন্মোচন করুন।

কবি বনমর্মর পর্দায় ফুটে উঠলেন। চোখ দেখেই এক্সের মনে হল কবিবর খুব টেনেছেন। কথা সামান্য জড়ানো। তিনি বলতে লাগলেন, কবিতাটি পড়ার আগে আপনারা দৃশ্যটি অনুধাবন করুন। একটি যুবক দু পা ফাঁক করে রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা রক্তমাখা ছ ইঞ্চি মাপের ছুরি, তার পায়ের ফাঁকে রাস্তার ওপর পড়ে আছে মধ্যবয়সী একটি মানুষ। এই কবিতা হল সেই হত্যাকারী ছেলেটির সংলাপ। ভূমিকা শেষ করে কবিবর থিয়েটারী ঢঙে পড়তে শুরু করলেন ঃ

লোকটা অ্যাতো ভয় পেলো মরতে
গীতা-টিতা পড়ে নি বুঝি
অথচ হিন্দুর ছেলে !
কী কিনেছিলো প্যাকেটে ?
বিস্কুট ?
আহা রক্তে গেছে ভিজে !
দু-অ্যাকটা খেয়ে দেখবো না-কি ?
মানুষেরই তো রক্ত !
হয়তো একটু নোনতা লাগবে !
মরতে অ্যাতো ভয় !

জানে না না-কি !
'জন্মিলে মরিতে হবে'
কতো কথাই বললে !
সব শুনেছি না-কি !
স্ত্রীর অসুখ, শুয়ে আছে
বিধবা হবে,
কি বলছিলো !
সব শুনেছি না-কি !
ছেলেটা এখনো ছোটো
স্কুলে না-কি পড়ছে !
মেয়েটা হয়েছে বড়ো
বিয়ে দিতে হবে,
এই আশ্বিনে ওর না-কি
আর একটা ছেলে হবে।
কি বাওয়া !
শোনোনি না-কি
সারা দিন রাত
সেই চিৎকার
ছোটো পরিবার সুখী পরিবার !
সেই মরলে
কিন্তু এমন করলে !
আরে ছি ছি !
পায়ে-টায়ে ধরে
কি যে নামতা পড়লে
মেজাজটাই গেল খিঁচড়ে
টুস্ করে ছুরি বসালুম বুকে
ফুস করে হাওয়া বেরিয়ে
চুস্ করে গেলে চুপসে
শালা জীবন যে অ্যাতো ঠুনকো
কেউ কি কখনও জানতো।
অ্যাখন কি আমার হাসা উচিত

না, তোমার দুঃখে কাঁদবো !
আহা, তোমার স্ত্রী !
তোমার স্ত্রী না-কি শুয়ে !
তোমার মেয়ের বিয়ে
তোমার ছেলে
অ্যাখনো পড়ছে স্কুলে !
থাক্ শালা পড়ে
এইখানে
কাত হয়ে
সারারাত তারা ভরা
আকাশের নীচে !
হায় জীবন !
একটা ছুরির খোঁচায়
গেলে চুপ্‌সে !

আরও হয় তো অনেক কবিতা শোনা যেত। আলো চলে গেল। অমরের মা বললেন এই আর এক জ্বালা—এই আছে, এই নেই। তিনি অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে, দেশলাই আর আলোর সন্ধানে গেলেন।

এক্‌স উঠে গিয়ে বারান্দায় চেয়ার টেনে বসলেন। সামনেই রাস্তা। রাস্তার ওপারে আর একটা বাড়ি। দোতলার ঘরের জানলা খোলা। কিছুটা অংশ চোখে পড়ে। কেঁপে কেঁপে বাতি জ্বলছে। খাটে একজন মহিলা শুয়ে আছেন। মাথার সামনে বসে এক বৃদ্ধ পাখার বাতাস করছেন। মহিলা মনে হয় অসুস্থ। এক প্রবীন দম্পতির জীবনচিত্র। মানুষ এক রহস্য! প্রেম, ভালোবাসা, সেবা, রক্ষা, হনন, ত্রাণ, বিবাহ, ব্যভিচার, পাপ, পুণ্য সবই চলেছে পাশাপাশি। যে মানুষ ক্যানসারের ওষুধ বের করার জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মাথাকে কাজে লাগাচ্ছে, সেই মানুষই আবার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারের পেছনে। এক হাতে অমৃত আর এক হাতে গরল। মানুষ! দেবতা আর শয়তান ফিউজ করে মানুষ নামক জীবের সৃষ্টি !
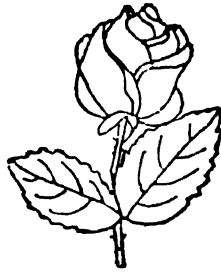
অমর অনেক রাতে এসে শুয়েছিল। এক্স জেগেই ছিলেন। সাড়াশব্দ করেন নি। অমরকে সামান্য অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল। তারপর কোনো এক সময় এক্স ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আর কিছু খেয়াল করেন নি। ঘুম একবার সামান্য তরল হয়ে এসেছিল। সেই সময় মনে হয়েছিল কেউ যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গলার স্বর খুবই চেনা। অমরের মা। ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলছেন। ডিপ্রেসানের আজ পর্যন্ত কোনও ওষুধ বেরোয় নি। যেমন বেরোয় নি ক্যানসারের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে এক্সের পিতা ধীরে ধীরে উন্মাদ হয়ে গেলেন। কেউ আর তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারলেন না। ওষুধ বলতে ঘুমের ওষুধ। একদিন নদীর ধারের একটা নির্জন জায়গায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল। মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

চোখের সামনে পিতার মৃত মুখ দেখতে দেখতে এক্স আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। একই ঘরে পাশের বিছানায় অমর তখনও ঘুমোচ্ছে। ছেলেটাকে বড় অসহায় মনে হল তাঁর। একটা ব্যাপারে প্রাচ্য ক্রমশ পাশ্চাত্যের মতো হয়ে উঠছে। স্নেহ ভালোবাসায় খরা আসছে। মানুষকে মানুষ আর অকারণে ভালোবাসবে না। স্বার্থে ভালোবাসার ভান করবে। কাজ ফুরালেই ভুলে যাবে। এই একটা বিষয়ে ক্যাপিট্যালিজম আর কম্যুনিজমে ভীষণ মিল। উৎপাদন যন্ত্রে যারা লেগে গেল, যতদিন

শরীরে শক্তি, ততদিন, শ্রমের বিনিময়ে, মগজের বিনিময়ে জীবন চালাও, তারপর! ওয়েলফেয়ার স্টেটে ওল্ড এজ হোম আছে, ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা আছে. সেখানে অবহেলায় মৃত্যুর অপেক্ষা করো। অনুন্নত দেশে সব সক্ষম মানুষই তো আর চাকরি পাবে না। তারা হল বোঝার মতো। তাদের বাঁচা-মরা নিয়ে কারুর কোনও মাথা-ব্যথা নেই। সভ্যতা বিজ্ঞান নিয়ে যত মাথা ঘামাচ্ছে, মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে তত মাথা ঘামাচ্ছে না কেন? মানুষ থেকে মানুষকে বের করে দিয়ে, জন্তু ভরে দেওয়াই কি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মাস্টার প্ল্যান!

এক্স বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। পোশাক পালটে নেমে পড়লেন রাস্তায়। এ কি দৃশ্য? পথের ধারে ধারে গরু আর মোষ এসে দাঁড়িয়েছে। ভিন্ন প্রদেশবাসীর বিচিত্র ভাষায় পাড়া একেবারে সরগরম। কাঙালীরা সার বেঁধে হাতে পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুধের আশায়। স্ট্রেট ফ্রম দি আভার। এক বলকের খাঁটি দুধ খেয়ে মগজ বাড়াবার বাসনা। মগজ বাড়ুক ক্ষতি নেই। বড় মগজের মানুষই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। দুধ তো অনেক বছর খাওয়া হল ভাই কাঙালী! দেশ এগলো কই? তোমাদের ভালো বিজ্ঞানী কই? কোথায় তোমাদের ভালো আইনজ্ঞ? ডাক্তার, অধ্যাপক, প্রযুক্তিবিদ, স্থপতি, শিল্পপতি, খেলোয়াড়, প্রকৃত দেশনেতা! গরু আছে। আছে ইনজেকসান। রক্ত দুধ হয়ে বেরিয়ে আসছে। ফুকো দেওয়া দুধ খেয়ে ফক্কিকারি মানুষ তৈরি হচ্ছে।

দূরে রাস্তার ধারে সরকারী দুধ প্রকল্পের গুমটি। সেখানেও কাতারে কাতারে মানুষ দুধের অপেক্ষায় হাত-পা ছুঁড়ছে। মহিলারা দুধ এগিয়ে দেবার বদলে, বিষণ্ণ, গোমড়া মুখ ঘুলঘুলি দিয়ে এগিয়ে দিয়ে, নীরবে জনসাধারণের গালাগাল হজম করে চলেছে।

রাগী রাগী চেহারার একজন যুবক বলছে, এই যে ম্যাডাম, আজ কি গল্প শোনাবেন? দুধ আসে নি কেন? বাছুরে খেয়ে গেছে?

মহিলা বললেন, দুধ যেখান থেকে আসে সেখানে যে গরু নেই। থাকলে বলা যেত বাছুরে খেয়ে গেছে।

চশমা চোখে একজন প্রবীণ মানুষ বললেন, তা ঠিক। এ হল কাউলেস মিলক। টিনের গরুতে দুধ দিচ্ছে।

আর একজন প্রবীণ বললেন, ওই দেখুন ব্যবসা করছে অবাঙালীরা। জল নেই ঝড় নেই, এভরি ডে গরু নিয়ে ঠিক সময়ে হাজির। সামনের মাস থেকে ওদের দুধই নেবো।

দুধ হলে নিতে আপত্তি ছিল না। ও মাল তো মশাই জল।

যা নিতে এসেছেন সেটাও কি দুধ?

তবু পাস্তুরাইজড।

ও মশাই নামেই পাস্তুরাইড। কাগজে রিপোর্ট পড়েন নি! বোতল ধোওয়া হয় না। প্ল্যান্ট সাফ করা হয় না, ঠাণ্ডা মেশিন চলে না, বোতল সিল করা হত, এখন আর হয় না। বছরে কোটি কোটি টাকা লোকসান।

সে মরুক গে। সরকারের টাকা।

হ্যাঁ, সরকারের আবার টাকা কি! সরকার কি আমাদের মতো রোজগারী মানুষ? খেটে খায়? ট্যাক্স করে আমাদের পকেট কেটে লোকসানের কারবার চলছে। ট্রানসপোর্ট, দুধ, বাড়িভাড়া। মন্ত্রীদের মাইনে, বিদেশ ভ্রমণ, বিধানসভায় খিস্তি করার জন্যে, জুতো ছোঁড়া-ছুঁড়ির জন্যে মোটা টাকার ভাতা, পার্টির চামচা পোষার জন্যে পেনসান।

আই সি, আপনি বুঝি নামপন্হী!

আমি কোনও পন্হীই নই।

তা হলে সাতসকালেই সামপন্হীদের শ্রাদ্ধ করছেন কেন? আলো চির-কালই জ্বলবে? গরু চিরকালই দুধ দেবে? পুলিস চিরকালই চোরডাকাত ধরবে? শিক্ষক চিরকালই ছাত্র ঠ্যাঙাবে? ছাত্ররা চিরকালই সুবোধ বালক হয়ে পড়বে? আপনার মশাই একেবারেই মিড্‌লক্লাস মেন্‌টালিটি!

মিড্‌লক্লাসের মিড্‌লক্লাস মেন্‌টালিটিই তো হবে। আপনি কোন্‌ ক্লাস? ক্যাপিট্যালিস্ট?

আমি আপার থেকে লোয়ার হয়ে, ওয়ার্কিং ছুঁয়ে বেগার ক্লাসের দিকে চলেছি। 'হ্যাভ-নটস' বলে একটা শ্রেণী আছে, জানেন কি? পৃথিবীতে তাদের সংখ্যাই বেশি। আমি সব সময় মেজরিটির

দিকেই থাকবো। আমি স্বার্থপর ধনী হতে চাই না, নিচমনা মধ্যবিত্ত হতে চাই না। আমার স্লোগান, বেগারস অফ দি ওয়ালর্ড ইউনাইট।

বন্ধুগণ,

রাস্তার গাছতলায়, জনপদের একপাশে, ভিক্ষাপাত্র পেতে বোসো। একবার দ্যাখো কি শান্তি! হাজার টাকা বাড়িভাড়া লাগবে না। নৃশংশ বাড়িঅলা এসে ফ্ল্যাট্ করে দেবে না। ইনকাম ট্যাক্সের মালেরা থেকে থেকে তেড়ে আসবে না। সার্বজনীনঅলারা বছরে চারবার এক হাতে চাঁদার খাতা আর এক হাতে খোলা কৃপাণ নিয়ে মহিষাসুরের মতো তেড়ে আসবে না। কোনও সম্বন্ধীর বিয়েতে ধরে করে সিল্কের শাড়ি কিনে, চোখে জল, মুখে হাসি নিয়ে আদিখ্যেতা করতে যেতে হবে না। বন্ধুগণ, ধনের বড় জ্বালা, নির্ধন হয়ে, হাতে হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। টাইম ইজ আপ্। হাফ্। লেফ্‌ট-রাইট, রাইট-লেফ্‌ট, একবার এ-দল, একবার ও-দল, লেফ্‌ট-রাইট, রাইট-লেফ্‌ট, ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি, না লেফ্‌ট, না রাইট, আমি তোমাদের দিয়েছি টাইট। দাদা, দুধ কি এসেছে? বাছুর কি বাঁট ছেড়েছে?

এর মধ্যে? আর একটু চালান। গরু এখনও গাবিন হয় নি। গরু ক'মাস গর্ভধারণ করে মশাই?

মানুষের মতোই। দশমাস দশদিন। কোনও তফাৎ নেই। ষাঁড়ের সঙ্গে মিলনের পর দশমাস অপেক্ষা করতে হবে। তারপর বাছুর দুধ ছাড়বে, তারপর সেই বাছুর মরবে। তারপর খড়ের বাছুর যারা সাপ্লাই করে তাদেব কাছে কোটেসান চাওয়া হবে। মন্ত্রীর কাছে ফাইল যাবে। সেখান থেকে যাবে ফিনান্সে। পড়ে থাকবে মিনিমাম তিনমাস। একদিন আসবে সেই বাছুর। তারপর সেই ডামি বাছুর হাতে গোয়ালা যাবে দুধ দুইতে। হঠাৎ আসবে ইউনিয়ানের নেতা। ঝাণ্ডা উঁচিয়ে বলবে, চলবে না, চলবে না। চুরির দায়ে চাকরি খাওয়া চলবে না, চলবে না। নিন্, নিন্ আপনারা সবাই তালে তালে আমার সঙ্গে নাচতে থাকুন. চলার চেয়ে, না-চলার কেমন একটা ছন্দ আছে দেখুন। চলবে না, চলবে না। চলছে-এ না, চলবে-এ না। নাচুন নাচুন, বেশ ব্যায়াম হবে। না

চলেই ব্যায়াম। চলছে-এ না, চলবে-এ না। কল চলে না, রথ চলে না, সংসার চলে না, ফাইল চলে না, চাষ চলে না, বাস চলে না, চলছে না, চলবে না।

নাঃ, অতুলদার মাথাটা সত্যিই একেবারে গেছে।

আপনারও যেতো মশাই। একমাত্র ছেলে, বিলেত থেকে ইন্‌জিনিয়ার হয়ে এলো। চাকরি নিলে পাওয়ার প্ল্যান্টে। ডিজর্ডার থেকে অর্ডার আনার চেষ্টায় যেই একটু কড়া হতে গেল, ইউনিয়ান দিলে কোতল করে। কারুর কোনও সাজাই হল না। পলিটিক্যাল মার্ডার মার্ডারই নয়। মার্ডারই নয়। শ্রেণী শত্রু নিপাত যাক। পার্জিং। আমাদের হলে, আমরাও পাগল হয়ে যেতুম।

কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে এক্স অনেকক্ষণ দিন শুরু দেখলেন। পৃথিবীর সেই সব দেশের কথা মনে পড়ল। যেখানে বাড়ির দরজার সামনে ভোরবেলা দুধের বোতল, আর সংবাদপত্র অপেক্ষা করে থাকে। বাড়ির মেঝের চেয়েও পরিষ্কার চকচকে রাস্তায় ঝক্‌ঝকে গাড়ি ছোটে। যেখানে সব মানুষের এক-রকম পোশাক। জীবনযাত্রার একটা সার্বজনীন মান যেখানে আছে। রকফেলার, ফোর্ড, টম, ডিক, হ্যারিকে ওপর দেখে চেনা যায় না।

এক্স ফিরে চলেছেন। বেড়াবার সাধ আপাতত আর নেই। দূরে একটা বস্তি। খোলা উনুনের ধোঁয়া, গলগল করে আকাশের দিকে উঠছে। হাই-ড্রান্টের জলে প্রায় বিবস্ত্রা নারীদের প্রকাশ্য রাজপথে স্নানবিলাস। শিশুরা বসেছে প্রাতঃকৃত্যে। দেশী কুকুরের দল ফ্যা ফ্যা ঘুরছে। এরই পাশ দিয়ে চলেছে সুন্দরী সুবেশা নারী। ফুরফুরে শ্যাম্পু করা চুল। বাতাসে উড়ছে। অঙ্গ-সুরভী ভাসছে বাতাসে। চায়ের দোকানে একদল নিষ্কর্মা যুবক। এক্স রাশিয়া আর চীনের সঙ্গে এই দেশকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। সব উন্নত দেশেই সময়ের মূল্য আছে। রাশিয়া হলে পুলিস এসে এই যুবক-যুবতীদের প্রশ্ন করত, তোমাদের এখন কি কাজ? উত্তর যদি হত—ছাত্র। পুলিস কান ধরে বাড়ি পাঠিয়ে দিত, যাও গিয়ে পড়ো। উত্তর যদি হত, আমি অসুস্থ, তুলে নিয়ে যেত হাসপাতালে।
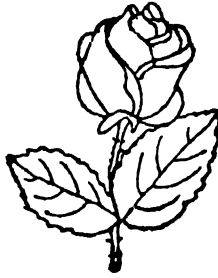
এক্স ফিরে এলেন অমরের ফ্ল্যাটে। অশান্ত সকালে প্রশান্ত প্রাতর্ভ্রমণ চলে না। এ শহরে বেড়াবার তেমন জায়গাও নেই। যতক্ষণ রাতের অন্ধকার ততক্ষণ শহরের চেহারা এক রকম। ক্যাটকেটে দিনের আলোয় বড়ই কুশ্রী। সহ্য করা যায় না।

দরজার সামনে পড়ে আছে সংবাদপত্র। প্রথম পাতার ছবি, যে কোনও দেশের সকালকে বিমর্ষ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। হার্ড পাণ্ড। এক্স নিচু হয়ে কাগজটা তুলে নিলেন। হাত ঠেকাতেও ভয় করছে। রাজপথের নারকীয় দৃশ্য। দগ্ধ, অর্ধদগ্ধ মানুষের দেহ। হাড়ের টুকরো। পাদুকা, ঝোলাঝুলি, হাত-ব্যাগ। একটি দেহ বড় স্পষ্ট। পাশ ফিরে পড়ে আছে। পাছার মাংস নরঘাতকরা শকুনের মতো খাবলে তুলে নিয়ে গেছে। মুখটা পাশ থেকে দৃশ্যমান। মাথার দিকটা পাথর মেরে চ্যাপ্টা করে দিয়েছে। নাকটা কেটে উড়িয়ে দিয়েছে। চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে চলে গেছে। বিদেশে এই ধরনের কিছু কিছু সাইকোলজিক্যাল মার্ডারার পাওয়া যায়। যেমন জ্যাক দি রিপার। কিছুকাল তারা টেরার সৃষ্টি করে চলে যায়। দলে দলে জ্যাক দি রিপার এ দেশে কোথা থেকে এলো ?

অমর শুয়ে আছে তখনও। বাইরের পোশাকেই শুয়ে পড়েছে। জামা-কাপড় পালটাবার সময় পায় নি। অমর মনে হয় লেট-রাইজার। ইওরোপ হলে এতক্ষণ শুয়ে থাকতে পারত না। দৌড়তে হত কর্মস্থলে। সে দেশের স্লোগানই হল—প্রোডিউস অর

পৌরিশ। এ দেশের যেমন—চলছে না, চলবে না। ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

জানলা দিয়ে এক্স দেখতে পাচ্ছেন ঘরের দৃশ্য। দরজা বন্ধ। এক্স বেরিয়ে যাবার পর, অমরের মা মনে হয় দরজা দিয়ে দিয়েছেন। টোকা মারলেন। একবার, দুবার, তিনবার। অমরের ঘুম ভাঙল না। অমরের মা-ও এলেন না। কোথায় আছেন ভদ্রমহিলা! বাথরুমে! রান্নাঘরে! যেখানেই থাকুন, না শোনার তো কথা নয়! এমন কিছু বড় বাড়ি নয়! এক্স এবার বেশ জোরে জোরে টোকা মারলেন। অমরের নাম ধরে ডাকলেন।

অমর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

দরজা খোলো অমর, তোমার মা কোথায়?

অমর উঠে এসে দরজা খুলে দিল। আড়মোড়া ভাঙল। চোখ রগড়াল। প্রশ্ন করল,

কোথায় গিয়েছিলেন?

ভোরে ঘুম ভেঙে গেল, এক চক্কর বেরিয়ে এলুম।

মা কোথায়? চা পেয়েছেন?

অত ভোরে চায়ের প্রয়োজন হয় নি; কিন্তু মা কোথায়? আমি অনেকক্ষণ দরজায় টোকা মারছি।

এত বেলা অবধি শুয়ে থাকার মানুষ তো তিনি নন।

অমর মা মা বলে ডাকল, সাড়া পাওয়া গেল না। আবার ডাকল, তবু সাড়া নেই। শোবার ঘর, রান্না ঘর, কোথাও নেই। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অমর দরজায় টুক টুক শব্দ করল। সরু হয়ে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। জল এমন একটা কিছুর ওপর পড়ছে, যা নরম। আলতো টোকায় কিছু হল না। অমর জোরে জোরে শব্দ করল। ভেতর থেকে কোনও সাড়া শব্দ এলো না। অমর বলল, কি ব্যাপার বলুন তো!

দরজা ভাঙতে হবে। ভাঙতে হবে খুব সাবধানে। ভেতরে কি অবস্থায় আছেন দেখার সুবিধে থাকলে বেশ হত।

ভেন্টিলেটার অনেক উঁচুতে। একটা মাত্র জানলা রাস্তার দিকে।

তুমি একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আনো দেখি, কি করা যায়!

সামনেই একটা গ্যারেজ ছিল। সেখান থেকে অমর মাঝারি মাপের একটা স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে এলো। এক্স যে দেশের মানুষ, সে দেশে ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। সকলেই সব রকমের কাজ শিখে মোটামুটি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

এক্স স্ক্রু-ড্রাইভারের সরু মুখ দিয়ে দরজার একটা প্যানেল নিমেষে খুলে ফেললেন। বাথরুমের মেঝেতে অমরের মা দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছেন। একটা হাত কলের তলায়। হাতের তালুতে জল পড়ে যাচ্ছে। এক্স আর অমর ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এলেন। বহুক্ষণ জলে ভিজে শরীর খসখসে সাদা। চোখ দুটো আধখোলা। মণি ঊর্ধ্বমুখী, স্থির। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে আছে। দুপাশে সামান্য রক্তের ধারা নেমে, শুকিয়ে আছে। জলের ধারা কিছু করতে পারে নি।

এক্স দেখেই বুঝেছিলেন, মহিলার দেহে প্রাণ নেই। কতক্ষণ আগে মৃত্যু হয়েছে, কি ভাবে হয়েছে, অটোপসি না করলে জানা যাবে না।

অমর বললে,

ভিজে কাপড় ছাড়ানো দরকার।

তুমি সবার আগে একটা কম্বল নিয়ে এসো, আর এখুনি একজন ডাক্তার কল দাও। অমর আলমারি খুলে একটা কম্বল বের করল। এক্স বললেন,

যা করার আমি করছি, তুমি অভিজ্ঞ একজন ডাক্তার ডেকে আন।

অমর উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে গেল। এতই বিচলিত যে জুতো পরার কথাও মনে রইল না। এক্স প্রাণহীন দেহটিকে কম্বলে জড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, এ মৃত্যু স্বাভাবিক না আত্মহত্যা! ডিপ্রেসানের রুগীরা মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যাই ডিপ্রেসানের একমাত্র ওষুধ। থ্রম্বোসিসও হতে পারে। মেয়েদের অবশ্য কমই হয়। হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পৃথিবী এমন একটা জায়গা, যেখানে, যে কোনও অঘটন ঘটতে পারে।

প্রবীণ স্থূলকায় একজন ডাক্তার এলেন। নিশ্চয় বাত আছে। সিঁড়ি ভাঙতে অসুবিধে হচ্ছে। ধীরে ধীরে হাঁটছেন। পা দুটো

যেন শরীরের ভারধারণে অসমর্থ। ভারবাহী বেশি ভার মাথায় তুলে ফেললে এই রকম টলমল হয়ে হাঁটে।

ডাক্তার নাড়ী দেখলেন। প্রথমে মণিবন্ধে। তারপর কনুইয়ের ওপরে। চোখের কোল টেনে দেখলেন। শেষে গম্ভীর মুখে বললেন, শি ইজ ডেড।

অমর দেয়ালে পিঠ রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিস্ময়ের গলায় বললে, শি ইজ ডেড! সে কি! কালও তো বেঁচেছিলেন। সুস্থই ছিলেন। মৃত্যুর কারণ?

অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। ন্যাচারাল, আনন্যাচারাল। এঁর সারা শরীর ভিজে কেন?

বাথরুমে ছিলেন।

আই সি। মৃত্যুর পক্ষে বাথরুম বড় শাস্তির জায়গা। আচ্ছা, আমি তা হলে চলি।

ডেথ সার্টিফিকেট?

শি ওয়াজ নট আন্ডার মাই ট্রিটমেন্ট, আমি কি করে সার্টি-ফিকেট দেব!

তা হলে কে দেবে?

আপনাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান।

তিনি বাইরে গেছেন হাওয়া খেতে।

আই অ্যাম হেল্‌পলেস। আমি কোনও রিস্ক নিতে পারব না। পুলিস কেস হলে আমার লাইসেন্স ক্যানসেল হয়ে যাবে, জেলও হয়ে যেতে পারে।

পুলিস কেস হবে কেন? এ তো মার্ডার নয়, আত্মহত্যাও নয়।

কে বলতে পারে?

তার মানে?

অ্যাসফিক্‌সেসানে মৃত্যু হয়েছে: দেখছেন না, লাংস ফেটে কষ বেয়ে রক্ত নেমেছে। ক্লিয়ার কেস। দম আটকে মৃত্যু। বাথ-টাবে, কি জলের বালতিতে মুণ্ডু চেপে ধরলে এই ভাবে মৃত্যু হতে পারে।

কি বলছেন আপনি?

এ পৃথিবীতে সবই সম্ভব মশাই। মানুষ অর্থের জন্যে, সম্পত্তির জন্যে কি না করতে পারে!

এ কেসে অর্থ, সম্পত্তি আসছে কোথা থেকে?

অনেক সময় আনবেয়ারেবল হলে মানুষ মানুষকে মেরে ফেলে। স্বামী অসুস্থ স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে আবার বিয়ে করে। স্ত্রী স্বামীকে কায়দা করে সরিয়ে দিয়ে উপপতির সঙ্গে জীবন পাতে। ছেলে বাপকে মেরে ফুর্তির জগতে উড়তে যায়। এইসব ঘটনা দেখে দেখে সাবধান হতে শিখেছি।

তার মানে বিপন্ন মানুষকে স্কুইজ করে আপনি টাকা খেতে চাইছেন। আমাকে অপমান করার অধিকার আপনার নেই।

একুস এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এইবার মুখ খুললেন। একস বললেন, এই প্রোফেসানে আসার আগে আপনি যে ওথ নিয়েছিলেন, তাতে তো আপনি এইভাবে বিপন্ন মানুষকে ফেলে পালাতে পারেন না। আপনার ধর্মই হল মানবসেবা।

হ্যাঃ, মানবসেবা! কেতাবি বুলি আওড়াচ্ছেন। এদেশের মন্ত্রীরাও তো ওথ নিয়ে আসেন। সো হোয়াট! এ দেশের ধর্মই হল—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমি ছাড়া, এ প্রোফেসানে আরও অনেকে আছেন, তাঁদের ডেকে আনুন। আমি কোনও আননেসেসারি রিস্ক নিতে পারব না, আমার বয়েস হয়েছে।

বয়েস যখন হয়েছে, তখন প্র্যাকটিস ছেড়ে দিন।

সে উপদেশ আপনাকে দিতে হবে না। আমার ব্যাপার আমি বুঝবো।

ব্যাপারটা তো আপনার একার নয়, পাঁচজনকে নিয়েই আপনার ব্যাপার।

ডাক্তার উত্তেজিত গলায় বললেন, অত কথার কি দরকার মশাই, সাফ কথা, আমি পারব না। আমার ভিজিটের বত্রিশটা টাকা ফেলুন, আমি চলে যাই। অত জ্ঞানের কথা শুনতে ভালো লাগছে না।

অমর বললে, আপনার ভিজিট তো ষোল, হঠাৎ বত্রিশ হাঁকছেন!

ডেডবডি ছুঁলেই আমি ডবল ফি নি।

কারণ?

অত কারণ-ফারণ জানি না। আপনার মা মারা গেছেন, এখনও অত কথা মুখে আসছে কি করে!

এক্স ওয়ালেট থেকে বত্রিশটা টাকা বের করে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিলেন। তিনি টাকা পকেটে পুরে, জয় গুরু বলে ব্যাগ হাতে চলে গেলেন।

অমর বললে, কি করা যায়! শেষে কি পুলিসেই খবর দিতে হবে?

এক্স বললেন, তোমাদের দেশ বড় অদ্ভুত, এখানে সহজকে জটিল, জটিলকে সহজ করা হয়।
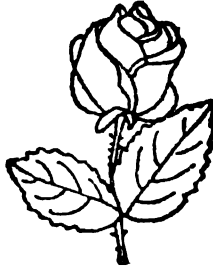
ডাক্তার বিদায় নিলেন। রাগে অমরের শরীর কিসকিস করছিল। বিপদ কিভাবে মানুষের মূলধন হয়ে ওঠে এ দেশে। অন্য সময় হলে অমর সহজে ছাড়ত না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। গলা ভেসে এলো, অমর আছিস, অমর।

গলা শুনে অমরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুব চেনা গলা। হাতকাটা নোলে আসছে। অমর মহা উৎসাহে, আয়, আয়, বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এক্স একটু অবাক হলেন। কে এমন ব্যক্তি, যাকে এত সমাদর।

প্রায় ফুট ছয়েক লম্বা এক যুবক অমরের পেছন পেছন ঘরে এলো। ভারি সুন্দর চেহারা। অনেকটা অ্যাপোলোর মতো দেখতে। এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। প্রসন্ন মুখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি। টকটক করছে গায়ের রঙ। ট্রাউজার পরা। গায়ে একটা পাতলা চাদর।

এক্স বুঝতে পারলেন না। ছেলেটি এই গরমেও গায়ে কেন চাদর জড়িয়ে রেখেছে! এ দেশে ম্যালেরিয়া আবার মহামারী হয়ে ফিরে এসেছে! সম্প্রতি জ্বরজ্বালা থেকে উঠল নাকি!

ঘরে পা দিয়েই যুবকটি বললে, এ কি, মাসীমার কি হয়েছে? অসুখ?

অমর এতক্ষণ বেশ কঠোর ছিল। নিজেকে আর সামলাতে পারল না। কেঁদে ফেলল। কান্না জড়ানো গলায় বললে,

মাকে ধরে রাখতে পারলুম না। চলে গেলেন।

সে কি রে? পরশু দেখে গেলুম ভালো রয়েছেন। আমার সঙ্গে কত কথা হল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে অমর ফুলতে লাগল কান্নার আবেগে। যুবক চাদরের তলা থেকে একটি হাত বের করে অমরের মাথার পেছনে রেখে বলতে লাগল,

শোকের কোনও সান্ত্বনা নেই জানি, তবু শক্ত হতে হবে ভাই।

অমর চোখ মুছে বললে, আয়, এঁর সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দি। বিদেশী সাংবাদিক মিস্টার এক্স। আমার অতিথি। মিস্টার এক্স, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নলিনী। আমরা দুজনে একই কলেজে পড়তুম।

এক্স উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলেন। অবাক হলেন, ছেলেটি ডান হাতের বদলে বাঁ হাত এগিয়ে দিল।

নলিনী বললে, কিছু মনে করবেন না, আমার ডান হাতটা নেই। উড়ে গেছে গত বছর।

কি করে?

বোম বাঁধতে গিয়ে। সামান্য একটু অসাবধান হয়েছিলুম। যাক গে, যা গেছে তার জন্যে আর শোক করি না। বাঁ হাতেই সব অভ্যাস করে ফেলেছি।

হঠাৎ বোম বাঁধতে গেলে কেন?

বোম, ছুরি, পিস্তল, পাইপগান ছাড়া এদেশে তো বাঁচা যাবে না। ছাত্র মানেই রাজনীতি, রাজনীতি মানেই অস্ত্র।

এক্স আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। একদিনেই তিনি বুঝে গেছেন দেশ কোন্ পথে চলেছে! বাঘের কথা মনে পড়ল। আহত বাঘ শিকার ধরতে পারে না। একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষের

ঘাড়ে। বড় সহজ, বড় দুর্বল শিকার। বাঘ একবার মানুষের স্বাদ পেলেই ম্যান-ইটার।

অমর বললে, তুই আমাকে বাঁচা ভাই। কেউ ডেথ সার্টিফিকেট দিতে চাইছেন না। পুলিসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বলছে এ কেস হয় হত্যা না হয় আত্মহত্যা। দুটোতেই কাটা-ছেঁড়ার ঝামেলা এসে পড়ছে। মায়ের গায়ে ছুরি চালাবে, ভাবতেও গা কেমন করে উঠছে।

কটা ডেথ সার্টিফিকেট তোর চাই। আমার সঙ্গে চল।

অমর এক্সের দিকে তাকিয়ে বললে, আমি ভীষণ দুঃখিত, লজ্জিত। আপনি দু'দিনের জন্যে এসে এইভাবে জড়িয়ে পড়লেন। কে জানত, মা হঠাৎ মারা যাবেন!

এক্স বললেন, তুমি আমার জন্যে ভেবো না অমর। তোমার কি কিছু টাকা লাগবে?

না. না, টাকা আমার আছে! আপনি আমার কাছে বত্রিশটা টাকা পাবেন, এসে দিচ্ছি। আপনার কিছুক্ষণ একা থাকতে অসুবিধে হবে না তো!

কিছুমাত্র না। তুমি ঘুরে এসো।

অমর আর নলিনী বেরিয়ে গেল। এক্স একা। বিছানায় কম্বল ঢাকা অমরের মায়ের মৃতদেহ। এ বাড়ির বাথরুমের কল পুরোপুরি বন্ধ হয় না। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়েই চলেছে সেকেন্ডর হিসেবে। নিস্তব্ধ ফ্ল্যাটে টিপ টিপ করে জল পড়ার শব্দ বড় অদ্ভুত লাগছে, যেন ঘড়ি খুলে মুহূর্ত ঝরে পড়ছে। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে একদল শিশুর চিৎকার। বস্তির শিশুদের ঘুম ভেঙেছে।

এক্সের মনে হল কম্বলটা খুলে দেওয়াই ভালো। একটু হাওয়া বাতাস লাগুক। তা না হলে দ্রুত পচন শুরু হয়ে যাবে। কম্বলের ভাঁজ খুলে খাটের দুপাশে ফেলে দিলেন। মৃত মহিলা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। ঠোঁটের কোণে কোথা থেকে অল্প একটু হাসি উড়ে এসেছে। যেন একটি মাত্র গাঙচিল শূন্য বেলাভূমিতে বসে আছে, ওড়া ভুলে।

এক্স কিছু দূরে একটা চেয়ারে বসলেন। মৃত্যুকে কখনও

এত কাছ থেকে, এমন সুস্থভাবে দেখেন নি। দার্শনিক চিন্তা তাঁর কমই আসে। যে দেশের মানুষ, সে দেশে দর্শনের চেয়ে কর্মই প্রবল। কিন্তু আজ এই নির্জন ঘরে মৃত্যুর মুখোমুখি বসে এক্সের কেমন যেন একটা উপলব্ধি হল—মৃত্যুর চেয়ে শান্তির আর কিছু নেই। জীবন যেন সারা জীবন হাপরের মতো ফুঁসতেই থাকে। সুখ আর শান্তি, লটারির মতো ভাগ্যে থাকলে তবেই পাওয়া যায়। জীবন অনেকটা কম্পিউটারের মতো, তাকে একবার কোনও ভুল খাওয়ালে, সারা জীবন সে কেবল ভুলই ওগরাতে থাকবে। সংগীতের মতো. একবার তাল কেটে গেলে আর তালে ফেরা যায় না।

প্রাণ বস্তুটাই বা কি? অক্ষত একটি দেহ কয়েক হাত দূরে। কালও এর গতি ছিল, ভাষা ছিল, ভাব ছিল, আবেগ ছিল, অনুভূতি ছিল। কি একটা দেহ ছেড়ে উড়ে গেল, এখন সব স্থির, নিস্পন্দ, নির্বাক। যত সময় যেতে থাকবে, দেহ বিকৃত হবে, দুর্গন্ধময় হবে। আপনজনও নাকে রুমাল চাপা দেবে।

এক্স সিগারেট ধরাতে গিয়েও ধরালেন না। মৃতের প্রতি সম্মান দেখান উচিত। মৃত মানুষের মুখেও একটা কিছু পড়ে থাকে। এক ধরনের বিহ্বল বিস্ময়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে একজন কেউ এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল যাকে দেখে জীবন চমকে উঠে, অসহায়ের মতো নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে। মৃতের মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, ভীষণ একটা জমাট আসর হঠাৎ ভেঙে গেছে। ভোজসভা চলতে চলতে, হঠাৎ সব আসন ছেড়ে উঠে গেছে। অর্ধভুক্ত খাদ্যসম্ভার পড়ে আছে সোনার আলপনা আঁকা প্লেটে। গেলাসে গেলাসে পড়ে আছে লাল পানীয়। মৃত্যু অনেকটা পণ্ড আয়োজনের মতো।

নিস্তব্ধ ঘরে ফোন বেজে উঠল। অদ্ভুত শোনাচ্ছে শব্দ। থেমে থেমে বেজে চলেছে জলতরঙ্গ, এক্স উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন।

ও প্রান্তে মহিলার কণ্ঠস্বর, হ্যালো, অমর বলছ?

না, আমি অমরের বন্ধু একস্। আপনি কে?

আমি শীলা।

কোথা থেকে বলছ?

একটা হোটেল থেকে। অমর নেই ?

বেরিয়েছে। এখুনি ফিরবে। অমরের মা মারা গেছেন। মৃতদেহ আগলে বসে আছি আমি।

অ্যাঁ, সে কি, মারা গেছেন ? কখন ?

ভোরবেলা।

যাঃ।

লাইন কেটে গেল। জল পড়তে লাগল টুপ্ টুপ্ করে। বাথ-রুমের বালতিতে। কোথাও একটা পাখি ডাকছে।
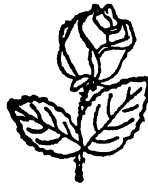
শীলাকে দেখলেই বোঝা যায় সারা রাত শরীরের ওপর ভীষণ অত্যাচার গেছে। বেচারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। প্রচুর মদ গিলেছে।

এক্সকে তাকিয়ে থাকতে দেখে শীলা বললে,

কি দেখছেন অমন করে ? অমর এখনও ফেরে নি ?

না, কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না। গেছে ডেথ সার্টিফিকেট আনতে। ভীষণ সমস্যায় পড়েছে। এক ডাক্তার এসেছিলেন। তিনি হত্যা কি আত্মহত্যা বুঝতে পারলেন না বলে সার্টিফিকেট দিলেন না। তুমি ভেতরে এসো। তোমার পা এখনও টলছে।

খুব দামী একটা ব্যাগ দোলাতে দোলাতে, বিলিতি এসেন্সের সুবাস ছড়াতে ছড়াতে শীলা ঘরে পা দিয়েই কেমন যেন হয়ে গেল। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন অমরের মা। মা কি আর বলা যায় ? যিনি শুয়ে আছেন, তিনি আর এ জগতের কেউ নন। কারুর সঙ্গেই তাঁর আর কোনও সম্পর্ক নেই। প্রাণ পরিত্যক্ত একটি দেহ মাত্র।

শীলা হাত ব্যাগটা ধীরে ধীরে একটা সোফায় নামিয়ে রাখল। যেন শব্দ না হয়। ঘুমন্ত মানুষ সামান্য শব্দেও জেগে উঠতে পারে। সিল্কের শাড়ির আঁচল বুক থেকে খুলে পড়ে গেল। কাঁচুলির পাশ দিয়ে অন্তর্বাসের ফিতে বেরিয়ে আছে। জামার পিছন দিকে একটা হুক ছিঁড়ে ঝুলছে। পেছন দিকে কোমরের কাছে একাট ক্ষতচিহ্ন লাল হয়ে আছে।

এক্স আর তাকাতে পারলেন না। মনে হলো মারকুইস দ্য সাদের সময়ে ফিরে গেছেন। একজন সাদ হাজার হাজার সাদ হয়ে ফিরে এলেন না কি! এটা কত সাল? ১৭৬৮। সাদ রোজ কেলার নামের এক মহিলাকে অপহরণ করে নিয়ে গেলেন তাঁর উদ্যানবাটীতে। মেয়েটিকে উলঙ্গ করে চাবুক মারতে শুরু করলেন। সেই রক্তাক্ত উলঙ্গ মহিলা চিৎকার করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল।

মানুষের ভেতর কে বাস করে? আবার ফিরে আসছে দার্শনিক চিন্তা। দর্শন মানুষকে বড় দুর্বল করে দেয়। শীলা পায়ে পায়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বিছানায় শায়িত মৃতদেহের দিকে। একবার মা বলে ডেকে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল খাটের ধারে। অসহায়ের মতো মুখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকাল, তারপর খাটের ধারে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে। ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়েছে খোঁপা। মেয়েটির বয়েস কত হবে? বড় জোর পঁচিশ। এখনও কত বছর বাঁচতে হবে এইভাবে, লালসার ইন্ধন হয়ে। কে বলেছিল, এ দেশের মানুষ মাতৃসাধক! তার কাগজের সম্পাদক। বই পড়ে একটা দেশকে কতটুকু জানা যায়!

এক্সের মনে হলো মেয়েটিকে এক চুমুক গরম লেবুর জল খাওয়াতে পারলে হ্যাঙওভার কিছুটা কমতে পারে। রান্নাঘর কোন্ দিকে জানা আছে। কেমন বা কি ধরনের ব্যবস্থা আছে জানা নেই। দরজা ঠেলে রান্নাঘরে ঢুকে এক্স অবাক। যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনি বৈজ্ঞানিক কায়দায় সাজান। যিনি চলে গেলেন, তাঁর হাতের স্পর্শ সর্বত্র। একই মাপের কৌটো পরপর র‍্যাকে সাজান। কোনওটায় চিনি, কোনটায় চা। ময়দা, আটা, সুজি, মশলা। গ্যাস

সিলিন্ডার, ওভেন। বাসন রাখার জায়গায় স্টেনলেস স্টিলের ঝকঝকে থালা, বাটি, গেলাস। প্ল্যাস্টিকের ঝুড়িতে পরিষ্কার করে ধোয়া আনাজপত্তর, আলু, পটল, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে। এক্সের যা প্রয়োজন তাও পেয়ে গেলেন, দু জোড়া বেশ বড় মাপের পাতিলেবু।

এক্স লেবুর জল নিয়ে ঘরে এসে দেখলেন, শীলা মৃতা মহিলার খাটে মাথা রেখে সেই একই ভাবে বসে আছে। পিঠের কাছে কোমরের ওপর ক্ষত-চিহ্ন লাল একটা জোঁকের মতো আটকে আছে। শাড়ির তলায় কত দূর নেমে গেছে কে জানে। এই মেয়েটি কিছু অর্থের জন্যে তার শয্যাসঙ্গিনী হতে এসেছিল। আজ মনে হচ্ছে, মেয়েটি তার মেয়ে। নিজের বয়েস তো কম হলো না। নিজের মেয়ে থাকলে এই বয়সেরই হতো হয়তো।

এক্স গেলাস হাতে মেয়েটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। শীলার চুলে একটা হাত রেখে ডাকলেন, শীলা।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। এই শীলাই একদিন বৃদ্ধা হবে। যতদিন না সেই বয়সে উঠছে ততদিন নিষ্কৃতি নেই। লোলুপ শিকারী-মানুষের শিকার হয়ে দিন কাটাতে হবে। খাদ্যের মতো। মাছের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে, মদের সঙ্গে নারী দেহ। এ দেশের কিছু মানুষের হাতে না খেটে পাওয়া অর্থের জোয়ার এসেছে। তারা একটি মেয়েকে বউ করে ঘরে তুলে রাখবে, আর রাত কাটাবে নিত্য নতুন মেয়ের সঙ্গে। যুক্তি খাড়া করবে, পলি-গ্যামি ইজ এ টেনডেনসি ইন ম্যান! সারা পৃথিবী আজ মানসিক বিকৃতির শিকার। বিকৃত রাজনীতি, বিকৃত সমাজনীতি, শিক্ষা-নীতি, মানুষের আচার আচরণ।

এজ অফ পারভারসান।

এক্স আবার ডাকলেন, শীলা।

শীলা মাথা তুলে ঘুমঘুম চোখে এক্সের দিকে তাকিয়ে বললে,

কে? বাবা? না, তিনি তো অনেককাল আগে মারা গেছেন। কে আপনি?

আমি তোমার বন্ধু, এক্স।

বন্ধু?

শীলা নেশা-জড়ানো গলায় হু হু করে হাসল।

এক্স বললেন, নাও খেয়ে নাও। শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

শীলা ডান হাত শালুক-ফুলের ডাঁটার মতো এক্সের দিকে এগিয়ে দিল। দু'হাতে দুটো বিলিতি রিস্টলেট। শীলা গেলাস না ধরে এক্সের গলা জড়িয়ে ধরল সাপের মতো। মুখটাকে টেনে আনার চেষ্টা করল নিজের মুখের দিকে। এক্সের ব্যায়ামপুষ্ট ঘাড় অত সহজে টলার নয়। নিজের হাতের আকর্ষণে শীলার শরীর ধনুকের মতো মেঝে থেকে উঠে পড়ে এক্সের কোলের ওপর ভেঙে পড়ল। শীলা জড়ানো গলায় গান ধরেছে, বন্ধু আমায় ভুল বুঝো না যেন।

এক্স গেলাসটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন। বুঝতে ভুল হয়েছিল, এ হ্যাঙওভার নয়। নেশা সবে জমেছে। শেষ রাত অবধি মদ্যপান চলেছে। এমন কারুর সঙ্গে যে নেশাগ্রস্ত এই মেয়েটিকে দরজার সামনে ছেড়ে দিয়ে গেছে, তা না হলে নিজের হেঁটে আসা সম্ভব হতো কি! এক্স দু হাতে শীলাকে মেঝে থেকে তুলে নিলেন। বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে। বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাক বেশ কিছুক্ষণ। এক সময় আপনি নেশা কেটে যাবে।

বিছানায় শোয়াতে গিয়ে এক্স লক্ষ্য করলেন শীলার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কোনও কোনও ক্ষত থেকে ক্ষীণ ধারায় রক্ত বেরিয়ে অন্তর্বাসে লেগে গেছে। শয়তান কোনও এক স্যাডিস্টের পাল্লায় পড়েছিল। কতকাল আগে কুপরিন লিখেছিলেন, ইয়ামা দি পিট। উচ্চবংশের লম্পটটা গণিকালয়ে গিয়ে মেয়েদের স্তনবৃন্তে আলপিন ফুটিয়ে রক্ত বের করে যৌন আনন্দ পেত। গোপন অঙ্গে অ্যাসিড মাখিয়ে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠত। সেই পিট, সেই নরক এদেশেও তাহলে তৈরি হয়েছে। মানুষ এক আবর্তনে ঘুরছে। অন্ধকার থেকে আলোতে, আলো থেকে অন্ধকারে। চাকার মতো ঘুরছে, সভ্যতা থেকে অসভ্যতা, অসভ্যতা থেকে সভ্যতা।

যে কোনো একটা অ্যান্টিসেপ্‌টিক জায়গায় জায়গায় লাগিয়ে না দিলে বেলা বারোটা একটার সময় মেয়েটি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। আজ শুয়ে থাকার দিন নয়। অমর আজ

শীলার সাহায্য চাইবে।

চাইতেই পারে। অমরের পাশে আজ শীলাকে দাঁড়াতে হবে। অমরের ড্রয়ার খুঁজে এক্স অ্যান্টিসেপ্টিক মলমের একটা টিউব পেলেন।

পিঠের দিকের ক্ষত কোমর ছেড়ে নিতম্বের দিকে নেমে গিয়ে পায়ের ফাঁকে ঢুকে গেছে। কী ভাবে মেরেছে! কি দিয়ে মেরেছে! মনে হয় বেল্ট ব্যবহার করেছে। লোকটির তাহলে নিশ্চয়ই বড় বড় নখ ছিল। আঁচড়েছে এবং কামড়েছে। সাবাস ভাই কাঙালী! এ কাঙালীর কাজ না অকাঙালীর! পশুর নখের মতো মানুষের নখেও ভীষণ বিষ থাকে।

অ্যান্টিটিটেনাস দিতে হবে না কি!

শীলা নেশার ঘোরে মা বলে পাশ ফিরল। আর সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেল বেজে উঠল। এক্স তাড়াতাড়ি শীলার গায়ে একটা চাদর টেনে দিলেন। রেগুলেটার ঘুরিয়ে পাখাটাকে খুলে দিলেন তিন পয়েন্টে।

নলিনী আর অমর ঘরে এলো। দুজনেই ঘর্মাক্ত। চেহারা প্রায় বিধ্বস্ত। অমর সোজা এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। নলিনী একটা সোফায় ধপাস করে বসে পড়ল! এক্স জিজ্ঞেস করলেন,

পেয়েছো?

পাব না মানে? এ দেশে পয়সা ফেললে কি না পাওয়া যায়। ডিগ্রি, ডিপ্লোমা। এভরিথিং।

এত দেরি হলো?

ওই যে ডাক্তারবাবু পুজোয় বসেছিলেন।

এক্স অবাক হলেন, জিজ্ঞেস করলেন, যে মানুষ পুজোয় বসেন, তিনি কি করে অন্যায় কাজ করেন?

নলিনী হাসল, হেসে বললে, এ দেশে ধর্মের সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ নেই। পাপেরও দেবতা আছে। বহুকাল আগে ডাকাতরা ডাকাতি করতে যেত ডাকাতকালীর পুজো করে। অনেকে এমনি মাংস স্পর্শ করেন না, বলির কচি পাঁঠার কোর্মা খান, কারণবারির ঢোঁক গিলে।

অমর ডায়াল ঘোরাচ্ছিল। লাইন পেয়েছে। কথা বলছে সৎকার সমিতির সঙ্গে। সেখানেও গোলমাল। কাল একই সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে অনেকেই ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন। সাতানব্বই জনকে শ্মশানে পেঁছে গাড়ি আসতে আসতে রাত ভোর হয়ে যাবে। অমর আর এক জায়গায় ফোন করল। অনেক কচলাকচলির পর একটা ব্যবস্থা হলো।

অমর রিসিভার নামিয়ে রেখে শীলাকে দেখতে পেল। এক্স চাদর টেনে দিলেও শীলার একটা পা বেরিয়ে আছে। অমর আশ্চর্য হয়ে বললে,

এ আবার কে?

এক্স বললেন, শীলা। খুবই অসুস্থ। প্রচণ্ড মদ খেয়েছে কাল রাতে। শুধু তাই নয় পড়েছিল কোনও স্যাডিস্টের হাতে। যত ভাবে অত্যাচার করা যায় ততভাবে অত্যাচার করে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। অমর একটানে চাদরটা টেনে নিয়ে বিছানার একপাশে ফেলে দিল। শীলা এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছে। অমর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে নরম গলায় ডাকল, শীলা।

কোনও উত্তর পেল না। এক্স বললেন,

ওকে ঘুমোতে দাও। বিকেলের দিকে ঠিক হয়ে যাবে।

কোন্ রাসকেলের কাজ?

নলিনী বললে, নিশ্চয়ই বড়দরের কেউ। ফরেন ঘোরা, তা না হলে স্যাডিস্ট হবে কি করে! বই পড়ে শিখে এসেছে। এদেশে এবার দেখবি বিলেতফেরত হোমোসেক্চুয়াল, পারভার্ট, স্যাডিস্ট। অনুকরণ ছাড়া আমরা আর কি জানি বল।

অমর চাদরটা টেনে দিল। নলিনী বললে, মাসীমার জন্যে কিছু ফুল আনা দরকার। দাঁড়া নিয়ে আসি।

কটাকা লাগবে?

টাকা? তুই কি সত্যিই আমাকে অমানুষ ভাবিস। সারা জীবন যাঁর স্নেহ পেয়ে এলুম তাঁকে যাবার সময় কিছু ফুল দেব না? মাসীমার খুব ইচ্ছে ছিল তীর্থে যাবার। আমাকে বলেছিলেন। সে আর হলো না। মহাতীর্থে একাই চলে গেলেন।

এক্স লক্ষ্য করলেন নলিনীর চোখ ছলছল করছে। মানুষ যতই হৃদয়হীন আর নিষ্ঠুর হোক না কেন, একটা জায়গায় সে বড় দুর্বল। মৃত্যুর কাছে তার কোনও জারিজুরি খাটে না। নলিনী ফুল আনতে চলে গেল। সব সেরে বেরোতে বেরোতে বেলা প্রায় তিনটে বেজে গেল। কাঁচের গাড়িতে মহিলা শুয়ে আছেন। বুকের ওপর বড় বড় পদ্ম। তার ওপর জপের মালা। গোছা গোছা ধূপ জ্বলছে। গাড়ি এগিয়ে চলল শ্মশানের দিকে। অমর গাড়িতেই গেল। নলিনী আর এক্স একটা ট্যাক্সি ধরে নিলেন। শবযাত্রায় কোনও আড়ম্বর নেই। নিঃসঙ্গ মানুষকে এই ভাবেই চলে যেতে হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের আসা আর যাওয়ায় পৃথিবীর কোথাও কোনো দাগ পড়ে না। কাঁদতে কাঁদতে আসা, নীরবে অলক্ষ্যে চলে যাওয়া।

নলিনী এক হাতে অদ্ভুত কায়দায় একটা সিগারেট ধরাল। এক্স জিজ্ঞেস করলেন,

তোমার একটা হাতের বদলে কি পেলে?

আমি কিছু পাই নি, তবে আমার দল ক্ষমতা পেয়েছিল কিন্তু রাখতে পারল না।
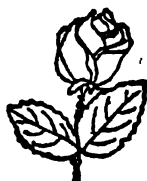
ক্যাওড়াতলা শ্মশানের সামনে গাড়ি এসে থামল।

এক্স ভেবেছিলেন চারপাশে একটা শোকের পরিবেশ থাকবে। কোথায় কি? চারপাশে যেন উৎসব লেগেছে। খাবার দোকান, চায়ের দোকান, ফুলের দোকান, ফলের দোকান, ছবি তোলার দোকান, কী নেই। দূরে এক সার পতিতালয়ও রয়েছে। প্রিয়জনের চির-যাত্রার পর মানুষের মন খারাপ হতেই পারে, তখন একটু জীব-সৃষ্টি-কর্মে মন দিলে ক্ষতি কি!

শববাহন থেকে অমরের মায়ের শবাধার নেমে এলো। চালক একটা খাতা বের করে অমরের সামনে ধরে বললেন,

নিন, নাম, ঠিকানা, মৃতের নাম, বয়েস, সময় সব লিখে দিন, আর লিখুন, পেড রুপিজ ফিফটি।

অমর লেখা শেষ করে রেজিস্টার ফিরিয়ে দিল। টাকাও দিয়ে দিল। টাকা হাতে নিয়ে চালক বললেন, আপনার কুড়ি টাকা সেভ করে দিলুম, দশটাকা আমার পাওনা।

নলিনী বললে, কী করে সেভ করলেন?

এই যে পাশে লিখে দেবো গরিব মানুষ। শুধু শুধু সত্তর টাকা দিতে যাবেন কেন? টাকা বাড়াবার, কমাবার ক্ষমতা যখন আমার হাতে রয়েছে, তখন সে ক্ষমতা কাজে লাগানো উচিত। আমরা যদি নিজেদের নিজেরা না দেখি, কাঙালী জাতি তো ভেসে যাবে। আমি মশাই আমার দেশবাসীকে যদ্দিন বাঁচবো, তদ্দিন দেখে যাবো। সেবাই আমার ধর্ম। নিন দশটা টাকা ছাড়ুন। একে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা।

নলিনী হাঁ করে লোকটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। অমর দশটি টাকা বের করে দিল। পকেটে টাকা পুরতে পুরতে সেই জনসেবী মানুষটি বললেন,

দুঃখু করবেন না। কোনো কিছুই চিরকালের নয়। সবই আজ আছে কাল নেই। আচ্ছা চলি তা হলে।

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলে গেল। রোগা, লম্বা, পাজামা পরা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, ছবি তুলতে হবে স্যার, ছবি?

নলিনী বললে, না।

সে কি স্যার, মাসীমার একটা স্মৃতি রাখবেন না?

আমরা রেখেই এসেছি।

একেবারে লাস্টে একটা তুলবেন না? প্লেনে ওঠার আগে যেমন তোলে!

আজ্ঞে না, আপনি আসতে পারেন। কেন বিরক্ত করছেন দাদা!

অ, বিরক্ত করা হলো? পরে দেখবেন মন খারাপ হবে, তখন আর আমাকেও পাবেন না এঁকেও পাবেন না।

সামনে সামান্য ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন দ্বিতীয়

খদ্দেরের খোঁজে। প্লেনে ওঠার আগে যদি কেউ ছবি তোলান। অমর আর নলিনী ধরাধরি করে বৈদ্যুতিক চুল্লির সামনে খাটটিকে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল। অসম্ভব ব্যাপার। নলিনীর দুটো হাত থাকলে হয় তো সম্ভব হতো। এক্স বললেন,

ধর্মে না আটকালে আমি সাহায্য করতে পারি।

অমর বললে, ভীষণ ভারি, আপনি পারবেন?

চেষ্টা করে দেখতে পারি।

চেষ্টা আর করতে হলো না। কোমরে গামছা বাঁধা চারটি ছেলে এগিয়ে এলো, লাইনে ফেলতে হবে দাদা? পার হেড দু'টাকা।

অমর বললে, তিনজন হলেই হবে, আমি তো রয়েছি।

না স্যার তা হয় না, একজন যে তাহলে বেকার হয়ে যাবে। আমরা চার-জনের গ্রুপ।

এক্স বললেন, অলরাইট। চারজনেই লেগে পড়ুন।

দলনেতা বললে, যুগ যুগ জিও গুরু। লেখাপড়া শিখে আমরা এই লাইনে এসেছি স্যার। তবে সে যা লেখাপড়া, কোনও কাজে লাগে না। না প্র্যাকটিক্যাল, না, থিওরিটিক্যাল। নাও ওস্তাদ, হাত লাগাও।

চারজন সট্ সট্ করে খাটের চারটে পায়ার কাছে সরে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল। খাট উঠল কাঁধে। বৈদ্যুতিক চুল্লির সামনে গিয়ে এক্স অবাক হয়ে গেলেন। এ দেশে জীবিতরাই লাইন দেয় না, তেলের, জলের, টেলিফোনের, ইলেকট্রিকের, সিনেমার, খেলার। মৃতদেরও লাইন পড়ে যায় সৎকার হবার। অমরের মায়ের খাট নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই, একদল প্রতিবাদ করে উঠলেন,

এখানে না, এখানে না, আগে অফিসে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে নম্বর নিয়ে আসুন।

ছেলে চারটির একজন বললে, জানি মশাই জানি। নম্বরে সরে গেলে সরিয়ে নোবো। শ্মশানে রাগারাগি করতে নেই। ছিঃ দাদা, এ হলো পরপারের পারঘাটা। একদিন আপনিও আসবেন, আমরাও আসব।

নলিনী আর অমর অফিসের দিকে চলে গেল। এক্স বললেন,

তোমাদের টাকা দিয়ে দেবো?

না স্যার, আমাদের কাজ তো এখনও শেষ হয় নি। আগে কাজ তারপর পেমেন্ট!

বাঃ তোমরা তো খুব অনেস্ট!

এ দেশের ছোটলোকেরা জেনারেলি সৎ। গোলমাল বড়দের নিয়ে। ছোটলোকের ধর্ম আছে, বড়দের স্যার কিছুই নেই। বুকনি আছে।

তোমরা অন্য কিছু করো না কেন?

করতে দেয় না বোলে। এ দেশের যুবকের জন্যে একটা রাস্তাই খোলা আছে স্যার। নেতাদের চামচাগিরি। নেতাকে ঝাণ্ডার মতো মাথার ওপর তুলে নেচে যাও—যুগ যুগ জিও।

তোমাদের দেশে নেতা আছে?

অঢেল, অঢেল।

তাঁদের কাজ?

বুকনি ঝাড়া। আর নিজেদের আখের গোছানো। এ দেশের স্যার বড় বড় দুটো স্তন। স্তন কাকে বলে জানেন? মাই, মাই। দুটো মাই। একটা বাম আর একটা ডান। একদল এটায় মুখ লাগিয়ে চুষছে আর একদল ওটায়! ছাগলের স্যার তিনটে বাচ্চা হয়েছে। বাঁট মাত্র দুটো। দুটো খায় আর তৃতীয়টা তিড়িং তিড়িং লাফায়। জনগণ হলো এই তিন নম্বর বাচ্চা।

তোমরা যখন এতই বোঝো, কিছু করো না কেন?

আমরা স্যার বুঝদার জাতি। জ্ঞানপাপী। পক্ষাঘাতের রুগী। কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কেউ কিছু করলে কাঠি দিতে পারি। হাসপাতালের চার নম্বর কর্মচারী আমরা। শুধু ডুস দিতে শিখেছি। ঘুষ আর ডুস এই দুটো নিয়েই আমাদের মেরু দাঁড়া, মেরু দাঁড়া কাকে বলে জানেন? স্পাইন।

নলিনী আর অমর হন হন করে ছুটে আসছে। ছেলে চারটির একজন বললে,

আমাদের আগে আরও দুজন আছে।

বডি কোথায় স্যার?

বলছে আসবে।

তার মানে খাবি খাচ্ছে। ওস্তাদ হাত লাগাও।

অমরের মায়ের খাট দু'ধাপ সরে এলো। ছেলেরা তাদের পারিশ্রমিক বুঝি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে এলো,

আমরা কাছাকাছিই আছি স্যার। প্রয়োজন হলে খুঁজে নেবেন। আর একটা কথা স্যার, ভদ্রমহিলার ডিটেলস একটু বলবেন।

অমর বললে, তার মানে ?

মানে, নাম, পিতার নাম, স্বামীর নাম, বয়েস, ঠিকানা।

সে জেনে তোমাদের কি লাভ হবে ?

আজ্ঞে ভূত ম্যানুফ্যাকচারিং সেন্টারে খবরটা দিলে, এই বেকারদের আরও দুটো পয়সা হবে।

সে আবার কি ?

সে একটা ব্যাপার স্যার। নির্বাচনের সময় কাজে লাগে।

নির্বাচনের সময় ?

হ্যাঁ স্যার ইনি ভোট দিতে যাবেন।

ইনি তো মারা গেছেন।

মারা গেছেন তো কি হয়েছে, ভোটটা তো আছে। প্রক্সিই তো পার্টির পাওয়ার। শেষ সময়ের ভরসা তো ভূতের ভোট। দেশে যত ভূত বাড়বে ততই তো যুগ যুগ জিও হবে।

আমি ও জিনিস সমর্থন করি না।

আপনার এলাকার যিনি নেতা তাঁকে আপনি সমর্থন করেন ?

না।

তাহলে ভোট দিলেন কেন ?

আমি তো ভোট দিই নি।

তাহলে তিনি কী করে রিটার্নড হলেন ? ওই ভূতের ভোটে ? ঠিক আছে স্যার আমরা অন্যভাবে জেনে নেবো। কয়েক টাকা কমিশন যাবে, এই আর কি !

কোমরে গামছা বাঁধা চার যুবক হন হন করে অদৃশ্য হয়ে গেল। অমর, নলিনী আর এক্স দাঁড়িয়ে রইল। চুল্লির দরজা খোলা হলো, সারির প্রথম অপেক্ষমান দেহ ইস্পাতের চাদরে শুয়ে হাজার ডিগ্রি ফারেন-হাইটের গনগনে অগ্নি বলয়ে ছাই হতে চলে গেল। দরজা বন্ধের বোদা শব্দ হলো। একজন মহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

অমর বললে, এক একজন শেষ হতে কতক্ষণ লাগে ?

নলিনী বললে, ঘণ্টা দুয়েক।

তার মানে চৌত্রিশ ঘণ্টা পরে আমাদের চান্‌স আসবে! সে কিরে ?

রোগাদের অবশ্য একটু কম সময় লাগবে, মোটাদের চর্বি গলতে একটু বেশি সময় নেয়।

অমর এক্‌সের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি কেন আর আমাদের সঙ্গে কষ্ট করবেন, একটা ট্যাকসি ধরে বাড়ি চলে যান। চিনতে পারবেন তো!

এক্‌স কিছু বলার আগেই একটা সোরগোল উঠল, ভি. আই. পি. মড়া আসছে, ভি. আই. পি মড়া। সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে পিল পিল করে একদল লোক এগিয়ে আসছেন। দু'জনের কাঁধে বিশাল এক খাট! খাটের ওপর চিরনিদ্রায় বিশাল এক ব্যক্তি। বুকের ওপর বড় বড় পদ্মফুল। খাট নেমে পড়ল লাইনের আগায়।

নলিনী বললে, হয়ে গেল অমর আরও তিন ঘণ্টা পেছোলে।

শববাহকরা চিৎকার করে উঠলেন, ভজাদা যুগ যুগ জিও। দলের একজনের হাতে একটা স্প্রেয়ার। স্প্রেয়ারটা আকাশের দিকে তুলে বাতাসে আতর ছিটোনো হলো। মোটা মতো এক চ্যালা কান্না ভাঙা গলায় বলতে লাগল, ভজাদা, তুমি আমাদের পথে বসিয়ে চলে গেলে।

আর একজন আক্ষেপের গলায় বললে, জানতেই যখন তোমার লিভারে ক্যানসার, তখন কেন তুমি অত মাল খেতে!

আর একজন বললে, ক্ষমতা-টমতা কিছু নয় আসলে ফ্যামিলি পিস না থাকলে মানুষ বাঁচে না।

আর একজন বললে, জানোয়ার, জানোয়ার!

নলিনী বলেল, চলুন, আপনাকে একটা গাড়ি ধরে দি। আমরা তো সেই পরশু ফিরবো!

এক্‌স আর নলিনী শ্মশানের বাইরে এসে দাঁড়াল। বেশ আঁধার আঁধার হয়ে এসেছে। পতিতালয়ের দিক থেকে একজন মহিলা খ্যানখ্যানে গলায় চিৎকার করছে—মিনসের মুখে মারি ঝাঁটা।
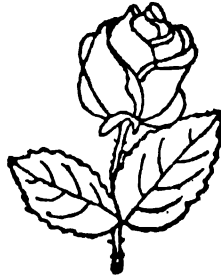
দরজার তালা খুলে এক্স ফ্ল্যাটে ঢুকলেন। অন্ধকার! কেউ আলো জ্বালায় নি। আলোর সুইচ খুঁজতে খুঁজতে এক্স অবাক হলেন, শীলা কি এখনও ঘুমোচ্ছে। মদের নেশা এতক্ষণ থাকে কি করে! সুইচে হাত দিতেই ঘরে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল। চতুর্দিক বড় এলোমেলো হয়ে আছে। যাঁর হাতে সব ছবির মতো হয়ে থাকত তিনি চলে গেছেন। সারাটি দিন গেল ঘরে ঝাড়ু পড়ে নি। গত রাতের এঁটো কাপ, ডিশ, থালা, গেলাস, সব ডাঁই হয়ে আছে। অমরের বিছানার চাদর এলো-মেলো হয়ে আছে। অমরের মা যে খাটে শুতেন, খাট আছে বিছানা নেই। বিছানা শব্দ শুষে নিত। বিছানা না থাকায় এক্স নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠলেন।

শীলা গেল কোথায়? বিছানায় নেই। বাথরুমে নেই। এক্স রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দেখলেন শীলা একটা ডেকচেয়ারে লম্বা হয়ে বসে আছে। মেঝেতে একটা খালি গেলাস। শীলা অলস চোখে এক্সের দিকে একবার তাকালো মাত্র। কোনও কথা বলল না। কথা বলার ইচ্ছে নেই।

চোখ মুখ ফুলে উঠেছে।

এক্স পাশের একটা খালি বেতের চেয়ারে বসলেন।

এখন কেমন বোধ করছ শীলা?

একই রকম।

তার মানে?

এ প্রসটিটিউট হ্যাজ নো লাইফ। শি ইজ এ কম্‌মোডিটি ফর হায়ার অর সেল।

আমি তোমাকে তোমার প্রফেসানের সঙ্গে জড়াতে চাই না। সব মানুষেই একটা মানুষ থাকে।

দর্শনের কথা থাক। অমর কোথায়?

শ্মশানে।

ফিরবে কখন?

গড ওনলি নোজ।

কি করি?

তোমার সমস্যাটা কি?

আজ সকালে কলকাতার এক হোটেলে একজন ইনডাসট্রিয়ালিস্ট এসেছে। এক ফিল্‌ম ডিরেক্‌টার আজ আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। তার আইডিয়া আছে, স্টোরি আছে ফিনান্‌স নেই। আমি যদি সেই ফিনান্‌স ম্যানেজ করে দিতে পারি টেন পারসেন্ট আমার।

টেন পারসেন্ট? দ্যাট মাস্ট বি এ বিগ সাম।

হ্যাঁ, আর সেই কারণেই আমাকে যেতে হবে; কিন্তু আজ আমি টোট্যালি আনফিট ফর এনি গেম।

তা হলে যেও না।

কিন্তু জীবনে সুযোগ এক আধবারই আসে মিঃ এক্‌স।

শীলা!

বলুন?

আমাকে তোমার কেমন লাগে?

আপনার তো আমি কিছুই জানি না সুতরাং লাগালাগির প্রশ্নই আসে না। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে।

জানতে ইচ্ছে করে!

যদি বলি তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

আমি বিশ্বাস করব না।

না করাই উচিত। কারণ জীবনকে তুমি অন্যভাবে দেখেছ। জীবনের অন্ধকার দিক তুমি যে ভাবে, যত ভাবে দেখেছ একজন

সাধারণ মেয়ে সেভাবে দেখার সুযোগ পায় না। প্রশ্নটা আমি অন্য ভাবে করি। তোমার কি ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে ?

করে, তবে আমি ভোগ আর ভালোবাসা দুটোকেই একসঙ্গে পেতে চাই। স্যাক্রিফাইস করতে হলে কিন্তু ওই ফ্যান্টাসিটাকেই করব, যার নাম ভালোবাসা।

তা হলে ধরো আমি তোমাকে দুটোই দিলুম।

তখনও একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

কি ?

যাচাই। কথা তো কথার কথাও হতে পারে ? সত্য কোথায় ?

ভালোবাসা কি যাচাই করা যায় ? জিনিসটা যে খুব সূক্ষ্ম। মাপার কোনও স্কেল নেই, ইউনিট নেই।

আমার একটা সন্দেহ আছে।

কি সন্দেহ !

আপনি আমাকে ভালোবাসতে যাবেন কেন ? হোয়াই ? আমি তো অনেক নিচের তলার জীব।

নিজের অ্যাসেসমেন্ট নিজে করা যায় না। সব মানুষই কোনও না কোনও কমপ্লেকসে সাফার করে।

আমি আপনার এ প্রস্তাবের কি উত্তর দেবো নিজেই জানি না। তবে আমার জীবনে অমর একটা ফ্যাক্টার।

আই নো, আমি জানি। সে কিন্তু তোমাকে সুস্থ জীবন দিতে পারবে না।

হি উইল ট্রাই টু ক্যাশ ইউ ফর মানি। তার ইনকাম খুব আনসার্টেন।

তবু, অনেক দিনের পরিচয়, অনেক দিনের পার্টনারশিপ। নিঃসঙ্গ মানুষকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

বেশ, আমার প্রস্তাব দেওয়া রইল, তাড়ার কিছু নেই। তাড়াহুড়োর বয়েস আমরা পেরিয়ে এসেছি।

শীলা চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে মাথা টলে পড়ে যাচ্ছিল। একস হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল। আর তখনই বুঝতে পারল শীলার জ্বর এসেছে। বেশ ভালো রকমের জ্বর। রাতেই একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কিন্তু কেসটা ভীষণ ডেলিকেট।

তোমার শরীর ভালো নেই শীলা। বেশ জ্বর হয়েছে। জানো কি, তোমার জ্বর হয়েছে ?

শীলা এক্সের চওড়া পিঠে হাত রেখে টাল সামলাতে সামলাতে বললে, জানি। এও জানি জ্বর আরও বাড়বে।

তোমার কোনও ডাক্তার জানা আছে ? তোমার নিজস্ব ডাক্তার ?

আছে। আমিই ফোন করছি।

শীলা পরপর দু জায়গায় ফোন করে টলতে টলতে বিছানায় আশ্রয় নিল। এক্স কফি তৈরি করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একটু খাবে ?

আধ কাপ।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ডাক্তার এসে গেলেন। তরুণ ছোকরা। উজ্জ্বল মুখে সুন্দর হাসি। শীলার সঙ্গে অনেক দিনের সম্পর্ক। এক্স ভদ্রতার খাতিরে বারান্দায় এসে বসলেন! বেশ ভালোই লাগছে। তেমন গরম নেই। প্রচুর বাতাস। ভেতরের ঘর থেকে ডাক্তার আর রুগীর কথা ভেসে আসছে। সামনের বাড়ির দোতলার ঘরে একটি মেয়ে নাচ শিখছে। বহু দূরে কোথাও সানাই বাজছে। এ দেশের বিয়েতে সানাই বাজাবার প্রথা আছে।

ডাক্তার চলে গেলেন। এক্সের সঙ্গে কোনও কথা হলো না। শীলা ঘর থেকে এক্সকে ডাকল, বাইরে গিয়ে বসলেন কেন ? মন খারাপ ?

এক্স ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আধুনিক মানুষের মন বলে কিছু নেই, একটা মোশান আছে। একটা গতি।

শীলা সামান্য অসংযত ভাবে শুয়ে আছে। জামা কাপড় এলোমেলো।

হেসে বললে, কি দেখছেন ?

তোমাকে।

কেন ?

তোমার চারপাশে আমার ইমোশান খেলা করছে !

এই তো বললেন, আধুনিক মানুষের মোশান আছে, তা হলে ইমোশান আসছে কোথা থেকে !

ফ্রম সেন্সেস। তোমরা যাকে ষড়রিপু বলো। যার ওপর

মনের কোনও কর্তৃত্ব নেই।

তা হলে ভালোবাসা ?

একটা কম্প্লেক্স ব্যাপার। অ্যানালিসিস করা বড় শক্ত ব্যাপার।

বসুন না। অমন পালাই পালাই করছেন কেন ?

আমি ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেছি শীলা। মনে হচ্ছে স্ট্যাসডেড হয়ে গেলুম এখানে এসে। তোমাদের দেশে এমন কিছু নেই যা ইতিহাসে ঘটে নি। সেই একই পুরনো ঘটনা। পুরনো সভ্যতা ভেঙে পড়ার সময় যা যা ঘটা উচিত তাই ঘটে চলেছে। রাতে যেমন বাদুড় ওড়ে, কোটর থেকে বেরিয়ে আসে প্যাঁচা, গর্ত থেকে মুক্তি পায় সরীসৃপ, অন্ধকারে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে আততায়ী, ঠিক সেই রকম। টোয়ালাইট অফ এ সেশাস। গোধূলি চলেছে। অন্ধকারের আয়োজন।

ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমার কপালে একটু হাত বুলিয়ে দেবেন ! ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

নিশ্চয়ই দেবো। উইথ প্লেজার।

এক্স বিছানায় বসে শীলার কপালে হাত রাখলেন। বেশ গরম। দুটো রগ দপ দপ করছে। রেশমের মতো চুলের গুছি কপালের দুপাশে ঝুলে পড়েছে। ফরসা টকটকে মুখ জ্বরের ঘোরে রক্তিম।

এক্সের হাতের ওপর হাত রেখে শীলা বললে, আরও জোরে, আরও জোরে ! ঘাড়ের কাছে।

এক্স বললেন, তোমার ওষুধের কি হবে ! প্রেসক্রিপসানটা রাখলে কোথায় ?

বালিসের তলায়।

এক্স শীলার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে বালিশের তলা থেকে যেই প্রেসক্রিপসান বের করতে গেলেন শীলা দু'হাত দিয়ে এক্সকে জড়িয়ে ধরল।

এক্স এই আচমকা আলিঙ্গনের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শীলার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

শীলা বললে, তুমি প্রথম দিন আমাকে রিফিউজ করেছিলে।

কেন করেছিলে ? বলো, কেন করেছিলে ? তুমি সেক্স চাও না ?

না। আমি যে দেশের মানুষ, সে দেশে প্লেন্টি অফ সেক্স। একটু ভালোবাসা চাই, ভালোবাসতে চাই। জেনুইন লাভ।

সেক্স ছাড়া লাভ হয় ?

অবশ্যই হয়। একমাত্র তোমাদের দেশেই হয়। শীলা আজ তুমি অসুস্থ। তোমার চিন্তাও অসুস্থ। ওসব কথা আজ থাক। তোমাকে এতকাল সবাই দেহ হিসেবেই দেখেছে, আমি তোমাকে নারী হিসেবে, শক্তি হিসেবেই প্রথম রাত থেকে দেখেছি। তোমাকে আমি অপমান করি নি, শ্রদ্ধা করেছি। সেই শ্রদ্ধা আরও বেড়েছে।

শ্রদ্ধা নয়, এ তোমার করুণা। বিদেশীরা যেমন অরফ্যানেজ থেকে অনাথ শিশু নিয়ে যায়, এ সেই রকম।

তোমাদের দেশের মেয়েরা তো পুরুষ চরিত্র বুঝতে পারে, তুমি পারছো না কেন ? আমার চোখের দিকে তাকাও তো।

শীলা দু'হাত দিয়ে এক্সের গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ক্রিঙ্ ক্রিঙ্ করে ফোন বেজে উঠল। এক্স শীলার বন্ধন মুক্ত হয়ে ফোন ধরার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছিলেন। শীলা আলিঙ্গন দৃঢ় করে বললে,

নো, নট নাও। বাজতে দাও। নরকের ঘণ্টাধ্বনি। ও হলো অক্টোপাসের শুঁড়। কাছাকাছি গেলেই জড়িয়ে ধরবে, আর ছাড়াতে পারবে না। তুমি কি আমায় অক্টোপাসের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে পারবে! আমার চারপাশে একটা চক্র ঘুরছে। নিজেকে আমি বিকিয়ে দিয়েছি। আমার বেরোবার পথ একটাই —মৃত্যু, ডেথ। আমাকে বের করতে হলে, মেরে বের করতে হবে। পারবে তুমি ?

অমর সে রকম ছেলে নয়। খুবই ভদ্র, নিরীহ।

হু ইজ অমর! আমার জীবন নাটকে অমর একটি পার্শ্ব চরিত্র।
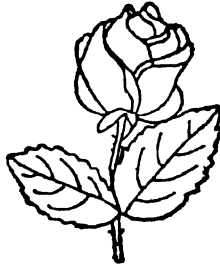
অধ্যাপক বি. বি. জি-র সঙ্গে দেখা একবার করতেই হবে। পুরনো বন্ধু। আসার আগে দুজনে চিঠিচাপাটি হয়েছে। অমরের অশৌচ। মায়ের শ্রাদ্ধ না হলে তার সাহায্য পাওয়া যাবে না। শীলা এখনও সেরে ওঠে নি। তার সারা শরীর বিষিয়ে ফুলে উঠেছিল। নিতান্তই অসহায় অবস্থা। মেয়েদের সেবা মেয়েরাই পারে। তবু এক্স যথাসাধ্য করেছেন। অমর নানা কারণে বিচলিত। সব চেয়ে বড় কারণ শীলার অচল অবস্থা। শীলার ফাঁদে বেশ কিছু রাঘব বোয়ালকে ফেলার কথা ছিল, পরিকল্পনা পাকা ছিল। সব কেঁচে গেল। শীলার কথাই ঠিক, একটা অলাত-চক্রে সে পড়ে আছে। ছাড়তে চাইলেও ছাড়া যাবে না। জীবন আর জীবনযাত্রা শ্যামদেশীয় যমজের মতো নাড়ীতে নাড়ীতে জড়িয়ে আছে।

এক্স পথে নেমে পড়লেন। বিচিত্র একটা পরিবারের সঙ্গে অকারণে বড় বেশি জড়িয়ে পড়েছেন। কোনও প্রয়োজন ছিল না। আবার ছিলও।

একটা দেশকে জানতে হলে তার মানুষকেও জানতে হয়। মানুষ কম্পিউটার নয়। তার শুধু মগজই নেই, মন বলেও একটা পদার্থ আছে। গত কয়েকদিন ধরে শীলাকে কেন্দ্র করে সে নানা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। জীবন কল্পনা। এমন একটা দেশে গিয়ে সেট্‌ল করতে হবে যে দেশে জীবন আছে। যে দেশে স্টেট দৈত্যের মতো জীবন গ্রাস করে ফেলে নি। জাপানে গেলে কেমন

হয়? অর্থনীতিতে আমেরিকা। জীবন পরিকল্পনায় প্রাচ্যের সৌন্দর্য। ধর্মে বুদ্ধভাবাপন্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ ফিনিক্সের মতো মাথা তুলেছে।

এক্স হাত তুলে মন্থরগামী একটা ট্যাক্সিকে থামালেন। মিটারের পতাকা নামাবার মৃদু ঘণ্টাধ্বনি। এক্স পেছনে না বসে, সামনে চালকের পাশে বসলেন। পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। কোথায় যাবেন?

এক্স রাস্তার নাম বললেন। এখান থেকে কত দূর?

তা স্যার সাত আট কিলোমিটার তো হবেই!

আপনার ব্যবহার অন্যান্যদের মতো তেমন রুক্ষ নয় তো?

তার কারণ স্যার, আমিই মালিক, আমিই চালক। এ দেশের রাজনীতি আমি বিশ্বাস করি না। আর স্যার আমি ভগবানকে মানি।

তার মানে ধর্মভীরু।

ধর্ম মানুষকে ভীরু করে না। অদ্ভুত এক ধরনের সাহস যোগায়, আত্মবিশ্বাস এনে দেয়, দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দেয়।

কি করে আপনি এমন হলেন?

আমার সংস্কারে ছিল স্যার। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রভাব হলো পিতামাতা।

নিশ্চয়ই শিক্ষিত আপনি?

এ দেশের মান অনুসারে আমাকে শিক্ষিত বলা চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আছে। তবে গাড়ি চালানোর বেশি আমার কোনও জ্ঞান নেই।

আপনার গাড়িতে আমাকে সারাদিন ঘোরাবেন? আমার গাইড হবেন। টাকা যা চাইবেন তাই পাবেন।

টাকা কোনও ব্যাপারই নয়। মিটার বলে দেবে ভাড়া।

তা হলে লেট আস স্টার্ট। দিন শুরু করা যাক। ওয়ান থিং কোথাও বসে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। আপনার আপত্তি নেই তো!

দোকানের খাবারে স্যার আমার ভীষণ ভয় আছে।

কেন ? এ শহরে অনেক ভালো দোকান আছে।

তা আছে। তবে এ দেশ খাদ্যের ব্যাপারে বড় উদাসীন। প্রতিটি জিনিসে ভেজাল। আর তেমনি অপরিচ্ছন্ন।

তবু তো কিছু খেতেই হবে। উপবাসে তো থাকা যায় না। যে কোনও পাঁচ তারা. কি ছতারা হোটেলে যাওয়া যেতে পারে।

সব সমান। কেউ কম দামী নোংরামি, কেউ বেশি দামী। চলুন আপনাকে এক চীনে বাড়িতে নিয়ে যাই। ভড়ং নেই, ভালো খাবার আছে।

পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে গাড়ি এক রাস্তায় ঢুকে পড়ল। চারপাশে স্তূপাকার নোংরা। জমে থাকা জলকাদা। দুর্গন্ধ। এক্স ঘাবড়ে গেলেন। এই ধরনের পরিবেশে তিনি ঠিক অভ্যস্ত নন। শেষ পর্যন্ত গাড়ি যে জায়গায় এসে থামল সে জায়গা অতটা অপরিষ্কার নয়। সহ্য করা যায়। একটা বসত বাড়ির বাইরের লম্বা ঘরে চৈনিক পরিবারের ছিমছাম ভোজনালয়। কাগজের ফুল, লণ্ঠন, লতাপাতা দিয়ে সাজানো। স্বাস্থ্যবতী মহিলারা ছুটোছুটি করছেন। সাধারণ পোশাক ; কিন্তু পরিষ্কার। হালকা ডিজাইন। এক্সের ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। এ দেশে বিদেশীরা কেমন গুছিয়ে বসে গেছেন। দেশীয় মানুষ ক্রমশ দুর্দশা আর দুর্নীতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। কোনও হুঁস নেই। কোনও বেদনা নেই। এক্সের কিন্তু খুব খারাপ লাগছে। এ দেশ তার নিজের নয়। এ দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কিছু এসে যায় না। কত প্রাচীন সভ্যতাই তো এইভাবে উঠেছে, আবার পড়ে গেছে। ইতিহাসের এই তো নজির। সমাজতত্ত্ববিদ পিটিরিম সোরোকিন অনেক পরিশ্রম, অনেক গবেষণা করে চারখণ্ডে বৃহৎ একটি বই লিখেছেন, সভ্যতার উত্থান ও পতনের চক্রাকার আবর্তন। মিশরীয় সভ্যতা খ্রীস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে যাত্রা শুরু করে হাজার বছরের মধ্যে তুঙ্গে উঠে পতনের চালু পথ ধরে খ্রীস্টের জন্মের কয়েকশো বছরের মধ্যেই অতলে চলে গেল। হেলেনিক সভ্যতার উত্থান আর পতনের সময় সীমা আরো কম। খ্রীস্টপূর্ব হাজার থেকে খ্রীস্টাব্দ পাঁচশোর মধ্যেই খতম। সভ্যতার নিয়তি। অনেক নাম মনে পড়ছে এক্সের, সুমেরু আক্কাডিয়ান, ইজিপসিয়ান, হেলেনিক,

এজিয়ান। সব এলো আর গেল। নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান। মনে পড়ছে টয়েনবির কথা, সভ্যতা যখন নমনীয়তা হারিয়ে আখরো-টের মতো খটখটে শক্ত হয়ে যায়, তখনই বুঝতে হবে মড়াক করে ভেঙে যাবার সময় এসেছে। যে সমাজ নমনীয়তা হারায়, সে সমাজের সর্বত্রই অসঙ্গতি। সুর লয় তাল সবই হারিয়ে যায়। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। সংঘাতে দুর্বল। পারস্পরিক খেয়োখেয়ি। তারপর যবনিকা।

ভাবতে ভাবতে কি যে খেলেন কিছুই বোঝা গেল না। ট্যাক্সি চালক যখন জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগল স্যার, এক্স সম্বিত ফিরে পেলেন।

বেশ ভালো। চীনে খাবার কখনও নিরাশ করে না।

চা খাবেন! এদের চা তেমন ভালো নয়।

তা হলে চলুন। উঠে পড়া যাক।

চা আপনাকে অন্য জায়গায় গাড়িতে বসে খাওয়াবো।

বেশ।

অধ্যাপক বি. বি. জি-র বাড়ি খুঁজে নিতে তেমন অসুবিধা হলো না। নতুন কলোনি গড়ে উঠেছে। ঝকঝকে নতুন নতুন বাড়ি। কে বলে কাঙালীদের পয়সার অভাব! এক শ্রেণীর মানুষ বেশ ধনী হয়েছে। তা না হলে বিশাল বিশাল বাড়ি এলো কোথা থেকে!

এক্সের নতুন বন্ধু ট্যাক্সি চালক বললে, বিলডিং মেটিরিয়াল-সের দাম গত দশ বছরে অসম্ভব বেড়েছে। সাধারণ মানুষ আর বাড়ি তৈরি করতে পারবে না। জমির দামও অসম্ভব বেড়েছে। ষাট হাজার, সত্তর হাজার, একলাখ, দেড়লাখ। কোনও মা বাপ নেই। ইট ছিল একশো দেড়শো টাকা হাজার। এখন হয়েছে সাড়ে সাতশো, সাড়ে আটশো। সিমেন্ট ছিল এগারো বারো টাকা বস্তা, এখন হয়েছে সত্তর পঁচাত্তর! বাড়টা একবার ভাবুন! এ দেশের কোনও মা বাপ নেই স্যার। আমরা অরফ্যান। সব মারোয়াড়ীদের দখলে। আমরা সব নিজভূমে পরবাসী।

অধ্যাপকের বাড়ি থম থম করছে। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে কুকুর চিৎকার করে উঠল। এক ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন।

অধ্যাপক বাড়িতে নেই!

কোথায় গেলেন?

তিনি হসপিট্যালে। আপনি ভেতরে আসুন।

পরিপাটি করে সাজান বৈঠকখানায় বসে এক্স যে কাহিনী শুনলেন, তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি রোমাঞ্চকর। অধ্যাপকের ছাত্ররা পুরো চব্বিশ ঘণ্টা ঘেরাও করে রেখেছিলেন। দাবি, সমস্ত ছাত্রকে পাশ করিয়ে দিতে হবে। একজনকেও ফেল করানো চলবে না। চব্বিশ ঘন্টা বেচারা বি. বি. জি. খাবার, জল, চা, কফি কিছুই পান নি, এমনকি প্রকৃতির ডাকেও সাড়া দেবার অনুমতি মেলে নি। চেপে বসে থাকতে হয়েছিল। যখন ছাড়া পেলেন অবস্থা শোচনীয়। হার্টের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টা চেপে বসে থাকায় ইউরেমিয়া মতো হয়ে গেছে।

এক্স নার্সিংহোমের ঠিকানা নিয়ে উঠে পড়লেন। শুনেই এসেছিলেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চরম অরাজকতা চলছে। সে অরাজকতা যে এই রকম জানা ছিল না। লেখাপড়ার আর দরকার কি, বন্ধ করে দিলেই হয়।

ট্যাক্সি চালক বললে, জানেন স্যার, এ শহরের মোড়ে মোড়ে এখন নার্সিংহোম। ভালো ব্যবসা। রাতারাতি সব বড়লোক। যে দেশের নব্বই ভাগ গরিব, সে দেশের ডাক্তারদের কিন্তু আঙুল ফুলে কলাগাছ। গাড়ি বাড়ি এবং চেহারা আর মেজাজ দেখলে মনেই হয় না, এঁরা জনসেবক। বোলচালও সব তেমনি। ভাবখানা গরিবের আর বেঁচে থেকে হবেটা কি! একদল মেরে ফাঁক করে দিলে আর একদল তো গরিব হবেই।

অধ্যাপক বি. বি. জি. অসহায় শিশুর মতো শুয়ে আছেন নার্সিংহোমের দোতলার একটি ঘরে। দেশীয় একটি নামী সংবাদ-পত্রের একজন রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফার এসেছেন। এক্স যখন ঘরে ঢুকলেন তখন ক্যামেরার ফ্ল্যাশ চমকাচ্ছে। অধ্যাপকের পোজ তো একটাই, তবু বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর শায়িত ভঙ্গীটি ধরার চেষ্টা চলছে।

এক্সের মনে হলো, সংবাদটির শিরোনাম হওয়া উচিত, শিক্ষা শুয়ে পড়েছে। স্যবহেডিং, মরণাপন্ন উচ্চশিক্ষা, নার্সিংহোমে

স্যালাইন চলেছে। একসকে দেখে বি বি জি. মৃদু হেসে একটা আঙুল তুললেন। দেশীয় রিপোর্টার ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছেন। অধ্যাপককে বললেন, এঁর সামনে কি ইন্টারভিউ নেওয়া যাবে?

আপত্তি কিসের?

আপত্তি মানে, এটা তো একটা কেচ্ছা কেলেঙ্কারি। নিজেদের মধ্যেই থাকা ভালো।

কিন্তু কাগজে যখন লিখবেন, তখন তো সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে। সারা পৃথিবীর লোক জানতে পারবে।

দ্যাটস্ ট্রু। তবে লেখার সময় সব কথা তো আমরা লিখবো না। কায়দা করে লিখবো। পার্টি ইন পাওয়ারকে আমরা চটাতে চাই না।

তাহলে, আমার স্টেটমেন্টের আর প্রয়োজন কি? নিজেরাই নিজেদের মতো করে যা হয় একটা কিছু খাড়া করে দিন।

তবু তো শোনা দরকার।

বহুবার শুনেছেন, একই কথা বারবার শুনে কি হবে?

অধ্যাপক বি. বি. জি. একসকে বসতে বললেন, এসো বন্ধু! দেখে যাও, রাজনীতির চিতায় মা সরস্বতীর সৎকার দেখে যাও। ইনটেনসিভ কেয়ারে শিক্ষা খাবি খাচ্ছে। এখন তখন অবস্থা।

স্থানীয় সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে আপনার মতে আমাদের কি করা উচিত?

প্রথমেই অধ্যাপক আর অধ্যক্ষদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দিতে হবে। তারাই হলো শিক্ষার সবচেয়ে বড় শত্রু। এদের কালো হাত ভেঙে দিতে হবে, গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

ছেলেরা তাহলে পড়বে কাদের কাছে?

কেন, নেতাদের কাছে।

নেতারা কিভাবে পড়াবেন স্যার? সব সাবজেক্ট কি তাঁরা জানেন? শিক্ষার নানা ফ্যাকালটি। অধিকাংশ নেতারই তেমন অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেসান নেই। যাঁদের আছে তাঁরা চর্চার অভাবে সব ভুলে গেছেন। রাজনীতি এক জিনিস, ছাত্র তৈরি আর এক জিনিস।

রিপোর্টার স্যার, আপনিও সেই পুরোনো মানসিকতায়

ভুগছেন। শিক্ষা মানে কি ?

শিক্ষা মানে শেখা, জ্ঞান বিজ্ঞান। ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, ম্যাথেমেটিকস, ইকনমিকস, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, ল।

শিখে কি হবে ?

কেরিয়ার তৈরি হবে। রোজগার হবে। দেশের মানুষের সেবা হবে। দেশ গড় গড় করে এগিয়ে চলবে। ধনধান্যে পুষ্পে ভরে উঠবে।

হয়েছে, হয়েছে। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, দর্শনে ইতিহাসে, ছাত্রসংখ্যা কমছে কেন ?

অবসোলিট সাবজেক্ট। ও সব না জানলেও মানুষের কিছু এসে যায় না।

মাতৃভাষার মাস্টারস ডিগ্রি এত ছ্যা ছ্যা হয়েছে কেন ?

মাতৃভাষা আবার শিখতে হয় না কি ? ও তো পেটের ভাষা।

পাশ করলে চাকরী পাবে ? ফরেনে যেতে পারবে ?

এই তো, নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। শিক্ষা মানে জ্ঞান নয়। ছাত্রের স্ট্যাম্প নিয়ে রাজনীতির দালালি করা। এ দেশের অফিস কাছারি কন্ট্রোল করছে ইউনিয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কন্ট্রোল করছে মাস্তান। গুণ্ডা মাস্তানকে অধ্যক্ষ করে দিন, কলেজ ক্লাব, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব তোফা চলবে। আমেরিকা থেকে আমদানী করুন, সেক্স ইন দি ক্যামপাস। কাগজে বিজ্ঞাপন পড়েছে, দশ টাকায়, দশ মিনিটে সাকসান পদ্ধতিতে অ্যাবরসান আর কি চাই !

আপনি খুব সিনিক হয়ে পড়েছেন। সব দেশেই কিছু না কিছু গোলমাল আছে। তিলকে তাল করলে তালই হবে। যৌবন কি মশাই অত হিসেব করে চলে ?

দ্বিতীয় আর একজন সাংবাদিক গটমট করে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফার। হাতে উদ্যত ক্যামেরা। এঁরা একেবারে জওয়ানের মতো মার্চ করে ঘরে ঢুকলেন। অধ্যাপককে কোনও কথা বলার অবকাশ দিলেন না। ক্যামেরা ফচাং ফচাং করে ফ্ল্যাশ ছাড়তে লাগল। ফটোগ্রাফার খাটের চারপাশে নরখাদক মানুষের কায়দায় নেচে নেচে, কখনও হাঁটু গেড়ে বসে, ডাইনে বাঁয়ে কাত হয়ে পাশবিক উত্তেজনায় ছবি তুলতে লাগলেন। সাট্ করে একটা চেয়ারে উঠে

পড়ে ক্যামেরার মুখ নিচু করে শায়িত অধ্যাপকের শেষ ছবিটি তুলে, ক্যামেরার মুখে ঢাকা লাগাতে লাগাতে সাংবাদিককে বললেন, চলুন, চলুন। আজ আবার বিশাল মিছিল আছে। মধ্যপ্রাচ্যে বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে ছেলেরা কনসুলেট ভাঙবে।

সাংবাদিক অধ্যাপকের সামনে এসে ঝড়ের বেগে প্রশ্ন করতে লাগলেন, শুনলুম জুতো মেরেছে। চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছে! শুনলুম প্যান্ট খুলে নিতে চেয়েছিল। ডানপাশের ঝুলপির আধখানা নাকি কামিয়ে নামিয়ে দিয়েছে। ফুল সিক্স আওয়ারস নাকি নিলডাউন করিয়ে রেখেছিল। সেই সময় নাকি শপাঁচেক ঘেরাওকারী ছাত্রছাত্রী প্রত্যেকে আপনার মাথায় একটা করে চাঁটা মেরে গেছে।

প্রতিটি প্রশ্নের পরই অধ্যাপক একবার করে হাত তুলে বোঝাতে চাইছিলেন, তাঁর কিছু বলার আছে। কে তাঁর কথা শুনবে! প্রশ্নের তোড়ে তিনি হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

সাংবাদিক বললেন, অলরাইট। আমরা নিউজটা সেই ভাবেই ফ্ল্যাশ করবো। রাজনীতি কিভাবে শিক্ষার বারোটা বাজাচ্ছে। যেহেতু আপনি অন্য রাজনীতিতে বিশ্বাসী, সেইহেতু ক্ষমতাসীন শাসকদল আপনাকে অপমান করে সরাতে চাইছে।

অধ্যাপক মিউ মিউ করে বলতে চাইলেন, না, ঠিক তা নয়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ও আমরা বুঝি। আপনি ভয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। শুনুন, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, উভয়েই সমান অপরাধী। পড়ুক না লাশ, সত্যি কথা বলতে ভয় পাবেন না। ট্রুথ, ট্রুথ। সত্য কথা বলার সময় এসেছে। কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ। ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকসান।

একসঙ্গে গোটা তিনেক কোটেশান ছেড়ে সরকার বিরোধী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি দুজন মার্চ করে বেরিয়ে গেলেন। এক্স প্রায় হাঁ হয়ে গেছেন। অধ্যাপক ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, নাও, এইবার আমার নামে কি লিখতে কি লেখে দ্যাখো!

অধ্যাপকের কথা শেষ হবার আগেই গোটা দশেক ষণ্ডামার্কা চেহারার লোক হুড়দুড় করে ঘরে এসে ঢুকলো। একজন

মিটসেফের মতো যে বস্তুটি ঘরের কোণে ছিল, সেটিকে লাথি মেরে উল্টে দিল। মেঝেতে শব্দ করে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল—চলবে না, চলবে না।

সরকার পক্ষের সাংবাদিক হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হচ্ছে ভাই ?

আন্দোলন।

আন্দোলন। ভেরি নাইস। স্টেটমেন্ট প্লিজ।

আপনি কে ?

আমি রিপোর্টার।

মার শালাকে। মার শালাকে। প্রতিক্রিয়াশীলদের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। মালিকপক্ষের চক্রান্ত নিপাত যাক, নিপাত যাক।

সাংবাদিক বলতে লাগলেন, আমি সে কাগজ নই, ওই কাগজ, ওই কাগজ।

বললে কি হবে! শুনছে কে! তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। এক্স কিছু বোঝার আগেই মারমুখী কর্মীদের ধাক্কায় সাংবাদিকের সঙ্গে জড়াজড়ি অবস্থায় মেঝেতে ছিটকে পড়ে গেলেন। অধ্যাপক আর্তনাদ করতে লাগলেন, পুলিস, পুলিস।

বহু দূর থেকে লাউড স্পিকারের গান ভেসে আসছে,

স্বপন যদি মধুর এত
হোক সে নিঠুর কল্পনা
জাগায়ো না তারে জাগায়ো না।

আন্দোলনের নেতা বিকৃত গলায় বলতে লাগলেন, মামুদের ডাকছে, মামুদের। তারা ঘুমিয়ে পড়েছে মানিক। যতই চেঁচাও পুলিস আর আসছে না।

এক্স উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই ক্ষিপ্ত কর্মীরা চিৎকার করে উঠল, উঠছে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। শুইয়ে দে, শুইয়ে দে।

এক্স আর সেই দেশীয় সাংবাদিকের উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা সফল হল না। ভাঙা ফার্নিচারের তলায় তাঁরা দুজনেই চাপা পড়ে গেলেন। বেশ মনোরম লাগছে। অধ্যাপক বি. বি. জি.-র কোনও সাড়াশব্দ নেই। মনে হয় ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন।

পাশ থেকে দিশী সাংবাদিক বললেন, আমার দুটো দাঁত মশাই মিসিং।

আপনার ?

আমার সবকটা দাঁতই আছে।

আপনার পরিচয়টা জানা হলো না ? আপনিও কি সাংবাদিক !

হ্যাঁ।

আপনার কাগজ পলিটিক্যাল কি সোস্যাল করেসপনডেন্ট নেবে না !

এ সব দেশে তো এখন অনেক কিছু হচ্ছে !

আমি কি করে বলব বলুন। নেওয়া না নেওয়া ম্যানেজমেন্টের ওপর নির্ভর করছে। আপনি আবেদন করে দেখতে পারেন।

এই ঘটনাটাকে আপনি কি স্ল্যান্ট দেবেন ?

আমি এটাকে খেলা হিসেবেও চালাতে পারি. আবার উন্মাদ আশ্রমে কয়েকঘণ্টা এই অ্যাংগুলে একটা স্টোরিও করতে পারি। আপনি কি করবেন ?

ভাঙা ফার্নিচারের তলা থেকে মাথা তুলতে তুলতে, সাংবাদিক বললেন, দাঁড়ান মশাই, আগে একটু ফ্রেশ এয়ার নি। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দু-চারটে চেয়ারের হাতল-মাতল, জানালা-দরজার ভাঙা অংশ, দুপাশে উলটে-উলটে পড়তে লাগল। বাল্ব আর ফ্লোরেসেণ্ট টিউবের ভাঙা কাঁচ আরও ভেঙে গেল। সাংবাদিক মুক্ত বাতাসে মাথা ভাসিয়ে দুঃখ মেশানো গলায় বললেন, আমার স্বাধীনতা বড় কম। আমাকে যা বলা হবে তাই লিখতে হবে। আমাকে লিখতে হবে, জনজাগরণ।

জাগ্রত জনতা ঘর ছেড়ে এখন সব সমবেত হয়েছে বাইরে। সেখানে খুব চিৎকার চেঁচামেচি। স্লোগানের তালে তালে আধলা ইঁট এসে লাগছে জানালার গ্রিলে দু এক টুকরো ঘরেও ঢুকছে। একুস ঠেলে ঠুলে উঠে দাঁড়ালেন। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। অধ্যাপক বি. বি. জি.-র মাথার ওপর একটা এনামেলের গামলা চাপিয়ে দিয়ে গেছে। সেটা সরাতেই অধ্যাপক মৃদু হেসে বললেন, যুগ যুগ জিও।

আর এখানে থেকে কি হবে! চলুন বাড়ি চলুন। আমি বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এসেছি।

ওই শুনুন, কি বলছে!

বন্ধুগণ, আমাদের এই আন্দোলন, আজ থেকে লাগাতার চলবে। যারা ভেতরে আছে তারা ভেতরেই থাকবে। যারা বাইরে, তারা বাইরে। যতদিন না আমাদের দাবি মিটছে ততদিন আমাদের এই অবরোধ। মনে আছে, ইরান কি করেছিল? অতবড় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে টলিয়ে দিয়েছিল। কম্যান্ডোদের কলা দেখিয়েছিল। আমাদের পথ, সংগ্রামের পথ। বোনাস চাই, বোনাস চাই। ওভার টাইম চাই, ওভারটাইম চাই। ইইন কিলাব।
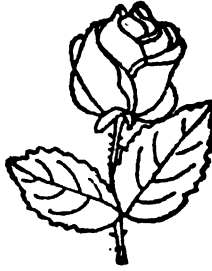
নার্সিংহোমের পেছন দিকে পাশের একটা বাড়ির নিচু ছাত। দুটো বাড়ির মাঝে চারফুটের মতো একটা প্যাসেজ। এ ছাত থেকে ও ছাতে লাফিয়ে পড়া এক্সের পক্ষে তেমন কোনও কঠিন কাজ নয়। বাঙালী সাংবাদিক তাকিয়েই চোখ বুজিয়ে ফেললেন,

অসম্ভব! দেখেই আমার মাথা ঘুরছে। কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।

কি ব্যবস্থা হবে! এই তো সাত আট ঘণ্টা হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের তো দেখাই নেই।

কি করে থাকবে। এদের ডিরেক্টার যে বিদেশে। ইন্টার-ন্যাশন্যাল কনফারেনস অ্যাটেন্ড করতে গেছেন।

তার মানে তিনি না ফেরা পর্যন্ত আমরা প্রিজনার।

আরে না না, এদের আমি চিনি, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই

ঝিমিয়ে পড়বে। সকলেরই তো কাজ আছে মশাই! এদের এক-জনও প্রোফেসনাল ঘেরাওকারী নয়।

সে আবার কি?

এদেশে মিছিলে যাবার জন্যে লোক ভাড়া পাওয়া যায়। ভাঙচুর করার জন্য গুণ্ডা পাওয়া যায়। ভাড়াটে উচ্ছেদ করার জন্যে কোর্টে যেতে হয় না। গেলেও কাজ হয় না। ধোলাই পার্টি আছে। অ্যামেচার দিয়ে নাচ, গান, বাজনা, নাটক হয়, সিরিয়াস কাজের কাজ কিছু হয় না। এ দেশ সব কিছুতেই হাই ডিগ্রি অফ প্রোফেস্যনালিজমে পেঁছে গেছে।

এক্স ছাত থেকে নিচে নেমে এলেন। পালাবার পথ দেখা হয়ে গেছে। এদিকে কিছু না হলে ওদিকের পথ খোলা। বাতাসে ছোট্ট একটি লাফ, হাওয়া। অধ্যাপককে উদ্ধার করা যাবে না। তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা বাইরে এসে বসে আছেন। ভেতরে আসার অনুমতি মেলে নি। একের পর এক গাড়ি এসে থামছে, চলে যাচ্ছে, আবার আসছে। মনে হয় বেশ একটা তৎপরতা চলেছে। অধ্যাপকের মতো অনেক বড়ো বড়ো রুগী রয়েছে এই হোমে। ধরবার করবার লোকেরও অভাব নেই।

সারা বাড়িতে ভূতের মতো অন্ধকার। আলোর লাইন কেটে উড়িয়ে দিয়েছে। ফোন কাজ করছে না। ঘরে ঘরে রুগী। বেশির ভাগই অপারেশানের কেস। আজ হোক, কাল হোক, কারুর অ্যাপেনডিক্স কেটে উড়িয়ে দিতে হবে. কারুর গল ব্লাডার, কারুর টিউমার। এক্স বসে বসে ভাবছেন আর অবাক হচ্ছেন। সারা পৃথিবীর মানুষ হঠাৎ কি রকম বোধবুদ্ধিশূন্য হয়ে পড়েছে। যার যা খুশি তাই করে চলেছে। সব দেশেই রাজনীতি ক্লাইমকে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে বসে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর মানুষকে নরঘাতক করে তুলেছে। হিটলারের ইহুদী নিধন, বৈজ্ঞানিক হত্যার পথ খুলে দিয়েছে। ভিয়েতনাম, লাতিন আমেরিকা, কামপুচিয়া, প্যালেস্টাইন, বেলফাস্ট। পৃথিবী যখন নিদ্রিত, আকাশে বাতাসে মৃত্যুর দূত তখন চক্কর মেরে চলেছে। প্রাণ, চাই প্রাণ, নিরীহ মানুষের প্রাণ।

-নটার সময় হঠাৎ একজন নেতা এলেন। ধ্বনি উঠল, যুগ যুগ

জিও। নেতা মিনিট পাঁচেক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। ঘুরে ঘুরে ভাঙচুর দেখে ভীষণ খুশি হলেন। অপারেশান থিয়েটারের দামী দামী আলো, এক্সরে যন্ত্র সব ছাতু। নিখুঁত কাজের পঞ্চমুখ প্রশংসা।

দেশী সাংবাদিক নেতার পেছন পেছন ঝুনুদা ঝুনুদা বলে পায়ে পায়ে ঘুরছেন। নেতা বললেন, রিপোর্টটা ব্যানার হেডলাইন করবেন। লিখবেন, একশ্রেণীর সমাজবিরোধী বিরোধীগোষ্ঠীর প্রশ্রয়ে এই সেবাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে। শেষ লাইনে লিখবেন, এইভাবে ক্ষমতা দখল করা যায় না। জনসেবাই ক্ষমতায় আসার একমাত্র রাজপথ।

ঝুনুদা, এক্সের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন,

এ আবার কে? হু আর ইউ?

আমি এক সাংবাদিক।

বিদেশী?

ইয়েস।

এখানে আপনি কী করছেন?

আমার এই অধ্যাপক বন্ধুকে দেখতে এসেছি। ছাত্র অরাজকতার শিকার। সুস্থ হতে এসে আপনাদের হামলায় আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

কি বললেন, আমাদের হামলা। মেরে তোমার থোবনা উড়িয়ে দেবো। ব্যাটা বিদেশী গুপ্তচর! কার হুকুমে তুমি এদেশে এসেছ?

যাদের হুকুমে আসা যায়। নিশ্চয়ই আপনার সে ক্ষমতা নেই।

বের করে দেবার ক্ষমতা আছে।

কোথা থেকে?

এখান থেকে।

নিশ্চয়ই এ দেশ থেকে নয়।

চেষ্টা করলে তাও পারি। জগা, দ্যাখ তো ব্যাটা ছবিটবি কিছু তুলেছে কি না!

আমার কাছে ক্যামেরা নেই।

জগা বিশ্বাস করিস নি। শুনেছি এদের জামার বোতাম টেপ

রেকর্ডার। এদের লাইটার ক্যামেরা।

সে আর আমাকে বলতে হবে না ঝন্টুদা। জেমস বন্ডের বই আমি মিস করি না।

বডি সার্চ কর। তার আগে আলো জ্বেলে দে। অন্ধকারে তেমন সুবিধে হবে না।

ঝন্টুদার কথায় আলো জ্বলে উঠল। জগা এগিয়ে এলো এক্সের কাছে। গলাটাকে যথাসম্ভব হেঁড়ে করে বললে, দেখি, লাইটারটা দেখি।

এক্স পকেট থেকে লাইটারটা বের করে জগার হাতে দিলেন। জিনিসটা হাতে নিয়ে জগা পরীক্ষা করতে করতে বললে,

গুরু মনে হচ্ছে সোনার।

ঝন্টুদা বললে, দেখি দে আমার হাতে। ওর ভেতর অনেক কেরামতি থাকে। বেশি টেপাটেপি করিস নি।

জগার লাইটারটা মেরে দেবার ইচ্ছে ছিল। বিষণ্ণ মুখে মালটা নেতার হাতে তুলে দিল।

এক্স বললেন, মন খারাপের দরকার নেই, আমার কাছে আরও লাইটার আছে, আপনাকে দেবো।

কাছে আর আছে ?

না, আমার ডেরায় আছে। একটা ছুরি দিন, বোতামগুলো কেটে দি। বিদেশী বোতাম, জামায় লাগালে লোকে তাকিয়ে দেখবে।

জগার পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে আধখানা ব্লেড বেরিয়ে এলো।

এক্স এক এক করে বোতামগুলো কেটে জগার হাতে তুলে দিলেন। জগা হাতে নিয়ে বললে, শালা সাংঘাতিক মাল। জেল্লা কি ? চোখ ঠিকরে যাচ্ছে। এ দেশটা শালা ভিখিরির দেশ।

ঝন্টুদা বললে, দে, আমার হাতে দে।

এক্স বললেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার আর একটা জামা আছে। সেই জামার বোতাম কেটে দিয়ে দেবো।

ঝন্টুদা বললে, জগা দ্যাখ তো সিগারেট ফিগারেট আছে কিনা !

এই নিন। মাত্র এক প্যাকেট। নেতা সিগারেট নিয়ে বললে,

যান, এখান থেকে কেটে পড়ুন। যা দেখেছেন তা লিখবেন না।

এ এমন কিছু নয় যে, লিখে সময় আর কাগজ নষ্ট করতে হবে।

আপনাদের মশাই বিশ্বাস নেই। বিদেশ থেকে খোঁচা মেরে উইকেট ফেলে দিলেন। সেবার প্রধানমন্ত্রীকেই চিৎ করে দিলেন। তবে লিখলেও আমাদের কাঁচকলা। তার আগেই কাজ হাসিল করে নেবো। যান, সরে পড়ুন।

আমার বন্ধুকে না নিয়ে আমি যাই কি করে?

থাক অত দরদে আর কাজ নেই। আপনি এখন মানে মানে সরে পড়ুন।

টাকা পয়সা কিছু আছে?

খুব বেশি নেই।

যা আছে দিয়ে যান। দেশে এখন খরা চলছে। ত্রাণ তহবিলে দান করে যান। পরের জন্যে বাঁচতে শিখুন।

এক্স এক গোছা নোট বের করে নেতার চেলার হাতে দিলেন। নেতা ছোঁ মেরে নোট কখানা ছিনিয়ে নিলেন। এক্স অধ্যাপকের কাছে সরে এসে বললেন, ভয় নেই। আপনার আত্মীয়স্বজন বাইরে অপেক্ষা করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন। আমি চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি। বেরিয়ে গিয়ে কিছু করা যায় কিনা দেখছি।

অধ্যাপক বললেন, কি আর করবেন? করার কিছু নেই। অনেক কালের একটা কথা আছে, পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। যত তাড়াতাড়ি পারেন, আপনি এ দেশ থেকে সরে পড়ুন। পৃথিবীর কোথাও ডেমোক্রেসি নেই। ব্যর্থ অনুসন্ধান। ও দেশে গেলে আবার দেখা হবে।

রাত এগারোটার সময় এক্স ফিরে এলেন অমরের আস্তানায়। অমর জেগেই ছিল। শীলা নেই। এক্স অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, সে কি, ওই শরীরে সে আজ বেরলো কেন? তোমার উচিত ছিল বাধা দেওয়া।

চেষ্টা করেছিলুম। কথা শুনলো না। শীলার জন্যে আমি ভীষণ চিন্তিত। ওর একটা কিছু হয়েছে। কেমন যেন বেসুরে বাজছে।

তোমারই দোষ। তুমিই তো ওকে এ পথে এনেছো।

ভুল কথা। এই পথেই ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আমি ওকে ফেরাতে চাই। কিন্তু এমন জড়িয়ে পড়েছে, সহজে সার্কল ছেড়ে বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। ওর জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়। ধীরে ধীরে চাঁদ যেমন আকাশ থেকে নেমে পড়ে, শীলাও সেই রকম চোখের সামনে নেমে চলেছে।

তোমার উচিত ছিল, ওকে ঘরে বন্দী করে রাখা।

কি করব বলুন, আমার মনের অবস্থা তেমন ভালো নয়, হঠাৎ একটা ফোন এলো। উত্তেজিত কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ, তারপর ফোন নামিয়ে রেখে দৌড়ল পাগলের মতো।

খান কতক স্যান্ডউইচ আর এক কাপ কফি খেয়ে এক্স বিছানায় আধ-শোয়া হলেন। অমরের মায়ের শূন্য ঘরে প্রথামত প্রদীপ জ্বলছে কেঁপে কেঁপে। কখন এক সময় চোখ বুজে এলো নিজেও বুঝতে পারলেন না। অমর শুয়ে আছে মেঝেতে কম্বলের বিছানায়। অশৌচ চলছে।

রাত তখন কটা কেউ জানে না। হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে এক্সের ঘুম ভেঙে গেল। অমরও উঠে পড়েছে ধড়মড় করে। অমর ওঠার আগে এক্স দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। দরজা খোলার আগে জিজ্ঞেস করলেন, কে?

আমি শীলা।

শীলার গলা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল। ভোর হতে এখনও ঘণ্টা খানেক দেরি। আকাশে অন্ধকার লেগে আছে। এক্স দরজা খুলতেই শীলা যেন এক্সের গায়ে উলটে পড়ল। সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। ফিস ফিস করে বললে, আমি খতম করে এসেছি। তুমি আমাকে বাঁচাও।

এক্স তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলেন। শীলা দেয়ালে পিঠ রেখে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। অমর বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, কাকে খুন করেছ?

সেই শয়তান, যে আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। যার টাকায় এ দেশের রাজনীতি চলে। যার টাকায় এ দেশের মাল উধাও হয়। যার টাকায় এ দেশের মস্তানরা মাল খায়। যার টাকায় এ দেশ

পাপে ছেয়ে গেল।

সে কি, তুমি তাকে খুন করলে? কি করে করলে?

খুব সহজে।

কেউ সাক্ষী আছে?

থাকতে পারে। অমর তুমি প্রশ্ন কোরো না। পারো তো তুমি আমাকে বাঁচাও।

কি করে বাঁচাবো?

রাত ভোর হবার আগে আমাকে এ দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

আমি এ অবস্থায় যাবো কি করে?

একস্, তুমি কিছু করতে পারো না?

পারি।

তা হলে করছ না কেন?

আমার বন্ধুর অনুমতি চাই।

অমর বললে, আমি এক্ষুনি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি। শীলাকে আমি কতটা ভালোবাসি আপনার ধারণা নেই। এমন কি শীলারও নেই!

অমর শীলাকে যদি হারাতে হয়, তুমি সহ্য করতে পারবে?

পারবো।

তুমি কি জান, আমাকে কি করতে হবে?

কি?

প্রথমে এ রাজ্য ছেড়ে আমাকে এমন একটা জায়গায় যেতে হবে, যেখানে যেতে পাসপোর্ট লাগে না। সেখানে গিয়ে শীলাকে আমায় বিয়ে করতে হবে। আমার বউ না হলে সে আমার দেশে থাকার ভিসা পাবে না। সিটিজেন হতে পারবে না।

কথা শুনে অমর থমকে গেল। জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে অন্ধকার আকাশ। মুখ ঘুরিয়ে এনে বললে, বেশ তাই হোক। তবু জানব শীলা বেঁচে আছে। আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন। শহর জেগে ওঠার আগে আপনাদের বহু দূরে চলে যেতে হবে। ত্রিসীমানার বাইরে।

এক্স বললেন, অমর তোমার কাছে একটা কাঁচি হবে। বড় কাঁচি।

অমর অবাক হয়ে বললে, হতে পারে। মায়ের বাক্‌সে বোধহয় আছে।

কাঁচি কি হবে?

এখন আর প্রশ্ন নয়। সময় বড় কম। রাত বড় তাড়াতাড়ি ভোর হয়ে যায়।

অমর একটা কাঁচি এনে এক্‌সের হাতে দিল। এক্‌স কাঁচি হাতে শীলার কাছে গিয়ে বললেন, আমি একটা অন্যায় কাজ করব। তোমার নিরাপত্তার জন্যে।

শীলা বসেছিল, বললে. কি করবে?

তোমার চুল খোলো। যতটা পারা যায় তোমার ভোল পালটে দেবার চেষ্টা করি। অনেকেই তোমাকে চেনে।

শীলার চুল প্রায় কোমর ছাপিয়ে নেমেছে। রেশমের মতো ঢলঢলে। কাঁচি হাতে এক্‌স কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। চুল হল সময়। বছরের পর বছর ধরে, একটু একটু করে বেড়ে কোমর পর্যন্ত নেমেছে। প্রতিটি গুচ্ছে দুঃখ সুখের ঝঙ্কার। না, ভাবলে চলবে না। এক্‌স খুব নিপুণ হাতে এক একটি গুচ্ছ কেটে কেটে সামনের টেবিলে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। চুলের প্রাণ নেই তাই, প্রাণীর সঙ্গী, তা না হলে প্রতিটি গুচ্ছ নড়েচড়ে আর্তনাদ করে উঠত।

শীলার মাথায় সুন্দর একটি বব তৈরি হলো। এক্‌স কাটা চুল ভালো করে সাজিয়ে ফিতের মতো ফাঁস দিয়ে অমরের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন. রেখে দাও। স্মৃতি। তবে সাবধান, তোমার বাড়ি সার্চ হতে পারে। এমন জায়গায় রাখবে যেন পুলিসের হাতে না পড়ে।

অন্ধকার ক্রমশই জোলো হয়ে আসছে। পাখির ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে নতুন দিন আসার অপেক্ষা। অমরের বাড়ি ছেড়ে দুটি মূর্তি রাস্তায় এসে নামল। মহিলার দিকে তাকালে সহজে চেনা যায় না। শীলা মেকআপে প্রায় বিদেশী হয়ে উঠেছে। চোখে এক্‌সের দেওয়া পোলারাইজড চশমা। আলোয় যার রঙ পাল্টায়। পরনে স্ল্যাকস আর কামিজ। ঠোঁট দুটো লিপস্টিকে লাল টুকটুকে। দোতলার জানালার ফাঁকে চোখ রেখে অমর দেখছে অপসৃয়মান

সেই ছবি। দূর থেকে ক্রমশই দূরে চলে যাচ্ছে তার জীবন স্বপ্ন। মায়ের ঘরে এই মাত্র প্রদীপটি সারা রাত জ্বলে নিবেছে। সলতের ধোঁয়া উদাসীর জটাজালের মতো এলোমেলো ঊর্ধ্বদিকে এঁকেবেঁকে উঠছে। জীবন এবার একেবারেই শূন্য হয়ে গেল। চোখে আর কিছু পড়ছে না। জনশূন্য পথ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হচ্ছে।

[শেষ সংবাদ]

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বই সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছে। পত্রপত্রিকায় পাতার পর পাতা উচ্ছ্বসিত আলোচনা। বহু দেশেই বইটি বাজেয়াপ্ত। বড় অদ্ভুত নাম—ডেমন অ্যাণ্ড ডেমক্রেসি। তার তলায় ছোট টাইপে, মেথডলজি অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস। লেখকের নাম, শীলা এক্স। উৎসর্গপত্রে লেখা, আমার ভারতীয় বন্ধুকে। 'কাঙাল দেশের কোনও একটি ঘরে দুটি, না, তিনটি জিনিস অতি সযত্নে সংরক্ষিত,

[এক] একটি কাসকেটে একগুচ্ছ সোনালী চুল।

[দুই] ওই গ্রন্থটি।

[তিন] সংবাদপত্রের একটি কাটা অংশ: হেড লাইন: শহর স্তম্ভিত। প্রভাবশালী শিল্পপতি এবং রাজনীতিক খুন। ছতারা হোটেলের একটি ঘরে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ নগ্ন, মধ্যবয়সী, মানুষটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। মৃতের হাতের মুঠোয় ছিল লম্বা একগুচ্ছ চুল। পুলিশের সন্দেহ হত্যাকারী, কোনও মহিলা।

গ্রহ

গৌরী চিঠি লিখেছে। অনেকদিন পরে।

দরজা খুলতেই অন্ধকারেও চিঠিটা নজরে পড়েছিল। চৌকাঠের কাছে পড়ে আছে। আমাকে কে আর চিঠি লিখবে! এক খুপরির একটা ঘরে, এক পাশে পড়ে থাকি। সকালে অফিসে যাই, সন্ধে-বেলা ফিরে আসি। ইচ্ছে হলে কোনও দিন ভাতে ভাত বসাই, নয় তো দুধ পাউরুটি দিয়ে চালিয়ে দি। জীবন এখন এমন সহজ সরল হয়ে গেছে, নিজেই মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়ে যাই। আমার মতো একটা ভোগী, বিলাসী মানুষের কি অদ্ভুত পরিবর্তন! পৃথিবীতে সবই সম্ভব! শুধু সময়ের ব্যাপার। রাজা ফকির হয়। ফকির রাজা হয়। মিলায়, সবই মিলিয়ে যায়, ছায়ায় ছায়া সম।

একা থাকি, বয়েস বাড়ছে, মন বড় অভিমানী হয়ে পড়েছে। আগে এরকম ছিল না। যাক, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। অতীতকে অতীতে রাখাই ভালো। ভবিষ্যৎ উঁকি-ঝুঁকি মেরে যাক ক্ষতি নেই। বর্তমানকে সয়ে নিতে পারাটাই হলো সাধনা।

সারাদিন ঘর বন্ধ ছিল। ঠাণ্ডা তাল তাল হয়ে জমে আছে! উত্তর দিকে একটা পুকুর আছে। আগাছার জঙ্গল। কেমন একটা জলপচা পাতাপচা গন্ধ চব্বিশ ঘণ্টা নাকে এসে লাগে। সন্ধে থেকে রাতভোর লাগাতার ঝিঁঝির ডাক। এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি কানে হঠাৎ ঝিঁঝিঁ লেগে গেলেও আর ধরতে পারি না। বর্ষায় হরেকরকম ব্যাঙের ডাক। জীবন একেবারে ভরপুর।

পুরনো নোনা-ধরা দেয়াল। ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে আর কত চাপা দোব! কাগজের পাশ বেয়ে ঝিরঝির করে বালি ঝরে। সারা রাত শুয়ে শুয়ে শুনি আর ভাবি মরুভূমি এগিয়ে আসছে। কাগজে পড়েছিলুম মরুভূমিকে ঠেকাতে হলে সারি সারি গাছ পুঁততে হয়। মনের মরুভূমি যখন বাড়তেই থাকে তখন কি গাছ পুঁতব? ভূতাত্ত্বিক নীরব।

আজ ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছে। বাসে ট্রামে আর গুঁতো-গুঁতি করতে পারি না। বয়েস হয়ে গেছে। শরীরে আর কি তেমন শক্তি আছে! সে ছিল এক সময়। যখন জলখাবারে চব্বিশখানা লুচি খেতুম কড়কড়ে আলু ভাজা দিয়ে। রবিবার রবিবার একাই উড়িয়ে দিতুম এক সের মাংস। খাইয়ে বলে খুব নাম ডাক ছিল। ওই তো সেই গৌরীর মা কলতলায় হড়কে পড়ে গেল। একাই তুলে নিয়ে এলুম পাঁজাকোলা করে। শিরে টানও ধরল না, কোমরে খটকাও লাগল না। এখন ভর্তি এক বালতি জল তুলতে ভয়ে মরি। মনে হয় কাঁধের খিল খুলে গেল বুঝি। ভয় পাই। ভয় পাবার মতোই অবস্থা। পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকলে দেখার তো কেউ নেই।

চিঠিটা অন্ধকারের মেঝে থেকে তুলে নেবার সময় ভেবেছিলুম, এ সেই হরিদ্বারের ত্রিযুগী নারায়ণ আশ্রমের স্বামী চেতনানন্দের চিঠি। মাঘ শেষ হলেই ফাল্গুনে উৎসব। মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাই। পরকালের কথাও তো ভাবতে হবে! কবে বলতে কবে ডাক এসে যাবে! মৃত্যুর তো কোনও বলা কওয়া নেই। নিঃশব্দে এসে গেলেই হলো! আর যে ভাবে এই শহরে লোক মরছে! মৃত্যু একটা সহজ ব্যাপার। এই আছে, এই নেই। এই তো অফিসে, পাশের চেয়ারে বসে অমূল্য সারাদিন কাজ করে গেল, টিফিনে ক্যান্টিন থেকে টোস্ট আর ঘুগনি আনিয়ে খেলে। হেসে ঠাট্টা করে, সারা অফিস মাতিয়ে রেখে সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরে গেল। পরের দিন অফিস গিয়ে অবাক। অমূল্য শেষ রাতে সরে পড়েছে। মানুষের জীবনের কোনও দাম আছে আজকাল ?

খাম খোলার পর তবেই বোঝা গেল চিঠি চেতনানন্দের নয়, আমার মেয়ে গৌরীর। আমার একমাত্র মেয়ে। হঠাৎ এতদিন পরে আমাকে মনে পড়ল। কি জানি! গৌরীর বয়সও তো বাড়ছে। আর কি যৌবনের সে তেজ আছে! আগ্নেয়গিরিও অগ্নুৎপাতের পর ঘুমিয়ে পড়ে। পৃথিবীতে এরকম মৃত আগ্নেয়গিরি কত আছে! জ্বালামুখ শান্ত। চিঠিটা তা হলে পড়া যাক। গিরিডি থেকে লিখেছে। চার পাঁচদিন আগের তারিখ।

পূজনীয় বাবা,

আমার এই চিঠি তোমাকে অবাক করে দেবে। কখনো তোমাকে তো আমি চিঠি লিখি নি। তুমিও লেখ নি। অবশ্য আমরা কোথায় আছি তুমি হয়ত জানতে না। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি যা করেছি তাতে সব বাবাই তাদের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিত। এতদিন পর বুঝছি, তোমাদের কথা না শুনে আমি ভীষণ ভুল করেছি।

তুমি হয়ত অবাক হচ্ছ, আমি কি করে তোমার ঠিকানা পেলুম! তুমি তো বাড়ি বেচে দিয়ে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছো! আমার সেই ছেলেবেলার বাড়িটা আর নেই—ভাবতেও চোখে জল আসে। এ কাজ কেন তুমি করলে? মা বেঁচে থাকলে পারতে না। তোমার কি এমন টাকার অভাব ছিল যে বাড়ি বেচতে হলো! আমি জানি, পাছে তোমার মেয়ে জামাই দাবি করে সেই ভয়ে তুমি আগেই সব শেষ করে দিলে। ভালোই করেছ। আমি বলব, তুমি বেশ করেছো!

বহুদিন পরে মেজমামার সঙ্গে হঠাৎ এখানে দেখা হয়ে গেল। তার কাছ থেকেই তোমার ঠিকানা পেয়েছি। তুমি নাকি আজকাল কারুকেই সহ্য করতে পার না। এ চিঠিটাও অসহ্য লাগলে ফেলে দিও।

তোমাকে চিঠি লিখছি কেন জান? তুমি ছাড়া এখন আমার আর কেউ নেই। খুব খারাপ অবস্থায় এই বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে আছি। ব্যবসা করব বলে এখানে এসেছিল। বহু লোকের টাকা পয়সা মেরে আজ মাসখানেক হলো পালিয়ে গেছে। সবাই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধরতে পারলে মেরে শেষ করে দেবে। এখানে অনেক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক আছে। ওর রোজগারের সহজ রাস্তা-টাই হলো ঠকান। আগে ততটা বুঝি নি। এখন যত দিন যাচ্ছে ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি কি চরিত্রের মানুষের পাল্লায় পড়েছি। তুমি তখন ঠিকই বলেছিলে, চকচক করলেই সোনা হয় না। চেহারা আর কথা দিয়ে ও মানুষকে প্রথমে বশ করে। যেমন করেছিল আমাকে। ভীষণ বিপদে পড়েই তোমাকে লিখছি। এখানকার এক অভদ্র ব্যবসায়ী আগরওয়াল আমার জীবন অতিষ্ঠ করে

তুলেছে। কোন্ দিন কি হয়ে যায়, আতঙ্কে দিন কাটছে। তার মুখের বুলি হয়েছে, টাকা গেছে যাক, তুমি তো আছ। লোকটা ভীষণ বদ। গিরিডি শহরের আর এক আতঙ্ক। তার দলবলও অনেক। যেমন ভাবেই হোক আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে। সংসার করার আশা আমি আর রাখি না। তুমি আমাকে এসে নিয়ে যাও। একলা যাবার সাহস নেই। রাতের অন্ধকারে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হবে। যদি আস চিঠি দিও। যদি না আস তাহলেও চিঠি দিও। —ইতি

গৌরী

চিঠিটা বার কতক পড়ে ফেললুম। গিরিডি। নাম শুনেছি, সেখানে একটা ঝরনা আছে। উশ্রী ফলস্। পরেশনাথ পাহাড় দেখা যায়। চিঠিটা পড়ার পর কত কথাই না মনে পড়ছে!

এই গভীর রাতে পৃথিবী যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন আমি এক আধবুড়ো ছন্নছাড়া লোক নিজের চিন্তা নিয়ে জেগে বসে আছি। সব ছাড়লেও অতীতে যেখানে যা বীজ ফেলে এসেছি, সেই বীজ থেকে এখনও একটা দুটো কাঁটা গাছ বেরোচ্ছে। তোমার ফসল এখনও নির্মূল হয় নি। যা করে এসেছি সেই কৃতকর্ম বিশ্বস্ত কুকুরের মতো এখনও পিছু ধরে আছে।

মাকে মনে পড়ছে।

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন। যে বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে গেল তারই দোতলার দক্ষিণের ঘরে পালঙ্কে শুয়ে আছেন! শীর্ণ। চোখ দুটো কিন্তু অসম্ভব উজ্জ্বল। কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমাকে ডেকে বললেন, বিনু, যাবার আগে তোর বিয়েটা দেখে যেতে পারব না। বউমার হাতে তোর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে যাবার বড় ইচ্ছে ছিল রে।

খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেল। পাত্রীর খোঁজ। মৃত্যুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মায়ের ছেলেবেলার বন্ধু পাত্রীর খোঁজ নিয়ে এলেন। দেখাদেখি আবার কি! বংশটি ভালো কি না দেখ। ভালো বংশেই বিয়ে হলো। বউও নেহাত খারাপ হলো না। রূপ আর গুণ দুটোই ছিল। মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধা হাসতে হাসতে ওপারে চলে

গেলেন। যাবার আগের দিন সংসারের চাবির গোছাটি বউমাকে দিয়ে বললেন, তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা।

বিয়ের সানাই থামতে না থামতেই মৃত্যুর সানাই বেজে উঠল।

কে যেন আমার হাত দেখে বলেছিলেন, শোন বাবা, সুখের আশা কোরো না। একে একে তুমি সব পাবে, আবার একে একে হারাবে। এমনও হতে পারে. তুমি পথের পাশে মরে পড়ে থাকবে। শেষের সময় কেউ তোমার মুখে একটু জলও দেবে না!

কত কথা তো কত লোক বলে। খারাপ হবে শুনলে একটু মন খারাপ হতে পারে। তবে মানুষ সব ভুলে যায়। এই তো গৌরীর কথা কেমন দীর্ঘকাল ভুলে ছিলুম। অতবড় একটা আঘাত কেমন সহজে মন থেকে মিলিয়ে গেল।

নাঃ, একটা কিছু করতেই হয়।

বড় অপমান করে চলে গিয়েছিল ঠিকই। যে আঘাত আমি সহ্য করে নিয়েছিলুম, সে আঘাত গৌরীর মা সহ্য করতে পারে নি। এমন ভেঙে পড়ল যে পৃথিবী ছেড়েই চলে যেতে হলো।

নাঃ, কারুর অপরাধের বিচার করতে বসি নি আমি। এ রাত নয়। যে রাতে গৌরী বাড়ি ছেড়েছিল। আমরা দুজনেই বলেছিলুম, বড় হয়েছ, যা ভালো বোঝ তাই কর, তবে তোমার ও মুখ আমাদের আর দেখিও না। কেন বলেছিলুম? অহঙ্কারে বড় লেগেছিল। কিসের অহঙ্কার? পিতৃত্বের অহঙ্কার। অহঙ্কারই বা বলি কি করে! আমরা তো আমাদের একমাত্র মেয়ের ভালোই চেয়েছিলুম। সে যে ভুল করতে চলেছিল. এই চিঠিই তো তার প্রমাণ।

যাক, এখন আর অতীতের শব-ব্যবচ্ছেদে কারুরই কোনও লাভ হবে না। এখন কিছু একটা করতে হবে। সহজে গৌরীকে কি উদ্ধার করে আনা সম্ভব হবে! মনে হয় না! অবস্থা তো খুবই গোলমেলে।

শত্রু অনেক। আমি জানি, মেয়ে আমার, আমার চোখে সে তনয়া। অন্যের চোখে সে ভোগ্যা। তার সব কিছু ছিনিয়ে নেবার জন্যে পৃথিবী প্রস্তুত। একবার যার পদস্খলন হয়েছে, পৃথিবীর লালসার স্রোতে তাকে ভেসে যেতে হবেই।

রামু এক সময় আমার বন্ধু ছিল।

বিহারের ছেলে। এ দেশে থেকে বাঙালী। পরিষ্কার বাঙলা বলে। বাঙালী বউ। রামু ব্যবসা করে। প্রয়োজনে ছুরিও চালাতে জানে। এমন মানুষ পয়সার মুখ দেখবে না তো আর কে দেখবে ? কেন জানি না, রামু এখনও আমাকে খাতির করার অস্পষ্ট একটা কারণ আছে। রামুর পিতা আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। দুজনেই ছিলেন পরম ধার্মিক। আমার পিতা দীর্ঘকাল দুমকায় ছিলেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার। রামুর পিতা ছিলেন সম্পন্ন ব্যবসায়ী। সত্য মিথ্যা জানি না। রামুর জন্ম আমার পিতার গ্লাভস পরা হাতে। জীবনের আশা ছিল না। পিতা ছিলেন ধন্বন্তরী। প্রসূতি আর নবজাতক দুজনকেই জীবন দান করেছিলেন। রামুর পিতা খুশি হয়ে আমার পিতাকে একটি দামী সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। সে ঘড়িটি নেই কিন্তু স্মৃতি আছে।

এজরা স্ট্রীটে রামুর এখন সাজান অফিস। অনেক লোকজন কাজ করে। সারা কলকাতায় ব্যবসার জাল ছড়িয়ে রেখেছে। ট্যাংরায় চামড়া, ক্যানিং স্ট্রীটে প্লাস্টিক, বেলেঘাটায় লোহালক্কড়, হাওড়ায় ঢালাই। বাঙালীর ছেলে এ সব বুঝবে না। ষোল বছর বয়েস থেকে রামু ব্যবসা করছে। গড়বড়ে ব্যবসা করতে গিয়ে বার দুই জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। ও সবে ওদের মান সম্মানের তেমন হানি হয় না। বরং সম্মান বেড়ে যায়।

হঠাৎ আমি রামুর কাছে কেন এলুম। রামু আমার কি করবে ? আমার মেয়ে পড়েছে বিপদে। আমি তার বাবা। যা করার আমাকেই তো করতে হবে। এমন দুর্বল মানুষ কেন যে মরতে সংসারে ঢুকেছিলুম ? যাক, এসেই যখন পড়েছি, একবার দেখা করে যাই।

যে চেয়ার গোল হয়ে ঘোরে, রামু সেই চেয়ারে বসে আছে। সামনে কাঁচ ঢাকা বিরাট টেবিল। নানা রঙের গোটা কতক টেলিফোন। রামুর সামনে একটু আগে কারা বসে গেছে। স্ট্র গোঁজা খালি ঠাণ্ডা জলের বোতল গোটা কতক পড়ে আছে।

রামু আমাকে দেখে হই হই করে উঠল।—আরে এসো দোস্ত। এতদিন ছিলে কাথায় ?

এই শহরেই হারিয়েছিলুম।

বয়েসটা দেখছি খুব বাড়িয়ে ফেলেছ। তোমার আমার প্রায় এক বয়েস। আমি দেখ কেমন সবজির মতো তাজা আছি !

সুখে থাকলে মানুষের বয়েস বাড়ে না।

আমি সুখে আছি ? নদীর এপার কহে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।

বাঙলা কবিতা তোমার এখনও মনে আছে ?

এই লাও, আমার বউ বাঙালী, আমার ছেলেমেয়েরা বাঙালী। আমার মেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে, আমি এক লাইন বাঙলা কবিতা বলতে পারব না। তাজ্জব। তারপর বলো কেমন আছ ?

খুব খারাপ।

কেন ?

প্রশ্ন করেই রামু বেল বাজাল। একজন বেয়ারা এলো ঘরে।

সব লে যাও। বলো, কি খাবে ?

কিচ্ছু না।

কেন ? তুমি কি বিশ্বসুন্দরীর মতো ডায়েটিং করছ ? না আমার পাপের পয়সা !

কোনোটাই নয় ! এই সন্ধেবেলা কেউ কিছু খায় নাকি ?

ধর্ম করছ ?

করলে তো হিমালয়ে চলে যেতুম।

তুমি কিছু খেলে, আমি খেতে পারি। খিদে পেয়েছে।

তা হলে তো খেতেই হয়।

রামু লোকটিকে বললে, সামোসা, ঔর কফি লে আও।

লোকটি চলে যেতেই বললে, বাড়ির খবর বলো। বউদি কেমন আছেন ?

নেই।

আই অ্যাম সরি। সো সরি। কি হয়েছিল ?

আত্মহত্যা।

সুসাইড ! মাই গড ! তোমার সঙ্গে এনি গোলমাল ?

নাথিং ! তুমি জান, আমার সঙ্গে কি রকম মিল ছিল ?

হ্যাঁ, সে তো জানি।

তবে ?

নার্ভাস ব্রেকডাউন।

কেন?

আমার মেয়ে!

তোমার মেয়ে? মেয়ে কি করেছিল? সে তো ভালো মেয়ে। সুইট, সুন্দরী।

ভালো ছিল না। খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

হোয়াট? তোমাদের মেয়ে খারাপ হয়ে গিয়েছিল! আই ডোন্ট বিলিভ।

ইট হ্যাপনড ম্যান। ট্রুথ ইজ স্ট্রেনজার দ্যান ফিকশান।

লাভ?

বলতে পার। তবে মোর দ্যান দ্যাট। পাপের দিকে তার একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল। পাপ করে আনন্দ পেত। যে কোনও অন্যায় কাজকে সে পুণ্য বলে মনে করত, গর্ব করত। শি ওয়াজ এ শপলিফ্‌টার, ড্রাগ অ্যাডিকট, ফ্রি সেক্‌স পছন্দ করত, সুযোগ পেলে মার্ডারারও হতে পারত। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, লেখাপড়ায় ভীষণ ভালো ছিল। এনি ড্যাম সাবজেকট তার কাছে জল-ভাত ছিল।

স্ট্রেঞ্জ! সে এখন কোথায়?

তার জন্যেই তোমার কাছে আসা। তোমাকে বিরক্ত করছি না তো?

, নট এ লিটল বিট।

তাহলে এই চিঠিটা পড়।

চিঠি পড়তে পড়তেই কফি আর সিঙাড়া এসে গেল। সিঙাড়ার চেহারা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। একটা খেলেই আমার মতো মানুষ কাত হয়ে যাবে। একেবারে এক জোড়া। রামু চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে তুমি যা বললে, তোমার মেয়ের চিঠি পড়ে তো মনে হচ্ছে না, সে খুব সাহসী। যে খেলতে জানে, সে তো সকলকেই খেলাবে। তুমি কোথাও একটা ভুল করে বসে আছ। নিজের মেয়েকে কোনো বাপ ওভাবে চিনতে পারে না। আমার মেয়ে আছে। চোখের আড়ালে সে কি করছে, আমার জানার উপায় আছে?

কেন নেই? পাপ কখনো চাপা থাকে না। ফুটে বেরোবেই পক্সের মতো। বিচার করে লাভ নেই। ঘরের মেয়ে এখন ঘরে ফিরে আসতে চাইছে। তোমার কাছে এসেছি সাহায্যের জন্যে। তুমি আমার সঙ্গে গিরিডি যাবে?

আমি গেলে তোমার কি সাহায্য হবে?

জায়গাটা চিনি না। তাছাড়া, কিছু বদলোক পেছনে। এসব ব্যাপার তুমি আমার চেয়ে ভালো বোঝ। পাশে থাকলে সাহস বাড়বে।

তুমি চাইলে আমার না বলার উপায় নেই। কবে যেতে চাও?

যত তাড়াতাড়ি হয়. ততই ভালো' আজ বললে আজই, কাল বললে কাল।

আমার হাতের কাজ একটু কমিয়ে নি। শনিবার দিন বেরোই চল। ট্রেনে নয়, আমার গাড়িতে। সঙ্গে আর একজন কাউকে নিয়ে নোব।

কাকে নেবে?

আছে, আছে। আমার হাতে সব রকমের লোকই আছে। সাধু চাইলে সাধু পাবে, খুনী চাইলে পাবে। পাপ পুণ্য, পৃথিবীতে দুটো স্রোতই খুব প্রবল।

শনিবার কখন আসব?

তোমাকে আসতে হবে না ঠিকানাটা রেখে যাও, আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।

কখন আসবে?

সকালের দিকেই আসব। একটু বেশি রাতে গিরিডিতে ঢুকব। সুবিধে হবে। কেউ জানতে পারবে না। ভোর রাতে তুলে নিয়ে চলে আসব।

রামুকে ঠিকানা দিয়ে আবার রাস্তায় এসে নামলুম। মনটা কিছুটা হালকা হলো। কাল বাদ পরশু। দুটো দিনে কি এমন এসে যায়! এতদিন যখন সামলাতে পেরেছে, জীবনের দুটো দিন তার কাছে কিছুই নয়।

রাতে একটা চিঠি লিখে ফেললুম, কাল ডাকে দোব। কোনও মানেই হয় না। চিঠির আগেই হয়ত আমরা পেঁছে যাব। তবু

লিখি। কতদিন পরে মেয়েকে চিঠি লিখছি। রক্তের সম্পর্কে পৃথিবীতে আমার ওই একজন তো আছে। মা বলে সম্বোধন করতে বেশ লাগে। কি হতে পারত, কি হয়ে গেল। সবই বরাত।

এখানে এখন রাত দুটো বেজেছে। গিরিডিতেও রাত দুটো। গৌরী এখন কি করছে! একা আছে তো। না না, একি পাপ চিন্তা!

মা গৌরী,

আমার চিঠি তুমি পেলে কি না জানি না।

সাবধানে থাক। আমি আসছি। খুব একটা জানাজানি করার প্রয়োজন নেই।

তুমি প্রস্তুত থেকো।

কোনোও কাজেই তেমন মন লাগছে না। নিজেকে যতই বন্ধনশূন্য, মুক্ত-পুরুষ মনে করি না কেন, মুক্তি কি সহজে মেলে! যত দূর মনে হয়, মৃত্যুতেই জীবনের মুক্তি। মৃত্যুর পরে কি আছে কারুরই জানা নেই।

বেশ সব ভুলে আসছিলুম। একটু একটু করে নিজেকে কেমন প্রস্তুত করছিলুম, তৈরি করছিলুম সেই অবশ্যম্ভাবীর জন্যে। মেয়েটা সব তালগোল পাকিয়ে দিলে। কেন তুই গেলি! কেনই বা এখন আবার বুড়ো বাপের উপর ভর করতে চাইছিস। এ যে আর তেমন লাঠি নয়। বেশি চাপ দিলে মট করে ভেঙে যাবে।

শুক্রবার রাতেই সব গোছগাছ করে রাখলুম! গোছাবার কিই বা আছে। টাকা পয়সা যেখানে যা আছে তুলেটুলে নিয়ে এলুম। পৃথিবীতে চিরকালই টাকার খেলা। এখন সেই খেলাই সব খেলাকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। সঞ্চয় আমার বিশেষ কিছু ছিল না। সংসারী মানুষের যেমন সঞ্চয় থাকে তাও না। তাছাড়া জীবনের প্রথম দিকটায় হাত বড় লম্বা ছিল। কেউ ভবিষ্যতের কথা বললে হেসে উড়িয়ে দিতুম। ভবিষ্যৎ আবার কি! জীবন তো বাতির মতো। জ্বলবে আর গলবে। তারপর এক দিন ফুস্।

কে জানত, এত ঘটনা ঘটবে। কে জানত জীবনের সায়াহ্নে

দেখার কেউ থাকবে না। নিজের বোঝা নিজেকেই বইতে হবে এই ভাবে। প্রথম মেয়ের পর সবাই ভাবে একটি ছেলে হবে। বউই মারা গেল তো ছেলে! লোকে ভবিষ্যত ভবিষ্যত করে বটে, কার ভবিষ্যত কোন্ পথে ছুটবে বর্তমানে দাঁড়িয়ে জানার উপায় আছে? নেই। এই যে কাল কি ঘটবে, কিংবা পরশু কি ঘটবে আমি জানি? কেউ জানে? সাধু, সন্ন্যাসীরা জানতে পারেন।

যাক্, অনেক রাত হলো। শুয়ে পড়া যাক। কালের মুখোমুখি কালকেই দাঁড়ান যাবে। রামু কটায় আসবে, সময়টা সেদিন ঠিক জানাল না। আমারও আর যোগাযোগ করা হলো না। দু'তিনবার টেলিফোনে চেষ্টা করলুম। এমন হয়েছে, লাইন আর কিছুতেই পাওয়া গেল না। উত্তর থেকে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। জানলায় অনেক ফাঁক-ফোকর। বয়েস হলে মানুষের শীত বেশি লাগে। রক্তের জোর কমে যায়। ছোকরারা এখন পাতলা জামা গায়ে ঘুরতে পারে। এখানে যদি এই শীত হয়, বিহারে তো হাড় কাঁপিয়ে দেবে। যাকগে যা হবার তাই হবে।

রাতে বেশ একটা উদ্বেগ ছিল। ভালো ঘুম হলো না। প্রথম পাখির ডাকেই উঠে পড়লুম। জীবনে ঘুমের রাত অনেক পার করেছি। বাকি কটা বছর না ঘুমোলেও কিছু এসে যায় না। সকালে চা করা একটা ভজঘট ব্যাপার। যখন বউ ছিল অত বুঝি নি। চা করো তো চা এসে গেল। যে ক'বছর আমার সঙ্গে ছিল কম চা করে দিয়েছে! হাজার হাজার কাপ। এক দিনের জন্যেও বিরক্ত হয় নি। কি মায়ের কি মেয়ে! আসলে আমার রক্তেই বিষ আছে। মানুষের মন তো অপরে দেখতে পায় না! তাই সব সাধু, ভালো মানুষ, অমায়িক ভদ্রলোক। সময় দেখার মতো, মন দেখার মেশিন থাকলে পৃথিবীতে ছুটোছুটি পড়ে যেত। মানুষ দেখলেই পালা পালা রব উঠত। যেমন বাঘ দেখলে হয়। এত বছর ধরে নিজের মন বয়ে বেড়াচ্ছি। আমি জানি, আমি কি! তাল তাল অন্ধকার পাক খাচ্ছে মনে। কত সরীসৃপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।

সিঁ সিঁ করে জল ফুটছে। এই সময়টায় মাধুর কথা খুব মনে পড়ে। মাধু আমার বউয়ের আদুরে নাম। মাধুরী থেকে মাধু। কেটলিতে জল ফোটে, সিঁ সিঁ শব্দ হয়, আমি বসে বসে ভাবি,

জীবনের কত নরম মুহূর্ত আমরা দু'জনে চায়ের কাপ নিয়ে কাটিয়েছি! কেটলিতে এখন একজনের চায়ের জল ফুটছে। তখন ফুটত দু'জনের।

আমার সেই গল্পটা মনে পড়ছে। সেই ইংরেজী গল্পটা। গল্পটা বলার কোনো মানে হয় না, তবু বলি। মানুষের দুর্বলতার গল্প। পৃথিবীতে মানুষ কত একা, কত নিঃসঙ্গ! সব প্রাণীই সঙ্গী খোঁজে। এমন কি নেকড়েরাও। আকাশের দিকে মুখ তুলে নির্জন প্রান্তরে হাহাকার করে ওঠে। তোমরা কোথায় এসো। আমি বড় একা। নেকড়েরা ছুটে আসে। মানুষ আসে না। মাঝরাতে মানুষ যদি ছাদে উঠে ডাকে, কই গো, তোমরা এসো। কেউ আসবে না। তারারা মিটি মিটি হাসবে। ঈশ্বর হলেন জেল-খানার চৌকিদার। প্রাণদণ্ডের আসামী তুমি. নির্জন কারাবাসই যে তোমার শাস্তি। জহ্লাদ ফাঁসির দড়িতে মোম ঘষছে। নির্দেশ পেলেই ছুটে যাবে।

না, চা ছাঁকতে ছাঁকতে সেই গল্পটা বলি। সেই ভদ্রলোক ছিলেন বীর যোদ্ধা। খুব বড় পরিবারের ছেলে। সৈন্য বাহিনীর বড় অফিসার। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখলেন সুন্দরী স্ত্রী মারা গেছেন! স্মৃতি, কিছু পোশাক-আশাক, দু-একটি চিঠি আর একটি ছবি। রোজ রাতে খাবার টেবিল সাজাবার সময় তিনি দু'জনের খাবার রাখতেন। একটি চেয়ারে স্ত্রীর সাদা একটি গাউন পরিপাটি করে বিছিয়ে দিতেন, চোখের সামনে রাখতেন স্ত্রীর ছবি। খেতেন আর স্ত্রীর ছবির সঙ্গে গল্প করতেন। নানারকম সাংসারিক গল্প. যুদ্ধের গল্প. ভবিষ্যতের নানা পরিকল্পনা। এমনভাবে কথা বলতেন, স্ত্রী যেন জীবিত। বছরের পর বছর ঘুরে যায়। একই নিয়মে চলে সকাল আর বিকেলের খাওয়া। হঠাৎ একদিন দেখা গেল ছবিতে কেমন যেন একটা পরিবর্তন আসছে। যুবতীর চুলে পাক ধরছে, মুখে বয়েসের রেখা পড়ছে, চোখের উজ্জ্বলতা কমে আসছে।

লেখক ওই ভাবেই গল্প শেষ করেছেন। আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় সকালে দু'কাপ চা নিয়ে বসি। এক কাপ আমার, এক কাপ আমার মাধুর। পরে ভাবি ওসব সেন্টিমেন্টের কোনোও মানে

হয় না। হিন্দু বিশ্বাস, মৃতের কথা যত ভাববে, আত্মার মুক্তি পেতে তত কষ্ট হবে। আত্মার আবার মুক্তি কি? অতসব গভীর তত্ত্ব আমার মাথায় আসে না। বিশ্বাসে নেই সংস্কারে আছে? জীবনের কথা বলতে বসেছি তাই ছোট বড় সব কথাই অকপটে বলে চলেছি। জীবনটা যে কি, না জন্মালে যেমন জানা যায় না, তেমনি না মরলে জানা যায় না মৃত্যুটা কি! দিবসের এই প্রায় অন্ধকার মুহূর্তে, সামনের আগুনের শিখা, কেটলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা গরম জলের বাষ্প, সিঁ সিঁ শব্দ, এ সবই কেমন যেন রহস্যের আবরণে মোড়া বিশাল কোনোও শক্তির প্রকাশ। যে শক্তিকে আমরা পরম উপেক্ষায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতায় পাশ কাটিয়ে যাই।

দেখতে দেখতে আটটা বেজে গেল। শীতের সকালের রোদ পাকা আঙুরের মতো বেশ মিষ্টি হয়ে উঠেছে। যাদের অবসর আছে, যাদের জীবনে বেশ সুখ আছে, তারা এমন সকালে কত কি ভাবতে পারে! কত কি করতে পারে! পুকুর থেকে বিশাল বড় একটা মাছ ধরে আনতে পারে। আমার ছিল সব এখন আর কিছু নেই! এই থাকা আর না থাকা এর ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। এ না কি নিয়তি।

চেয়ে দেখেছিলে আমাকে নিবিড় সুখে
বিচ্ছেদে আজ খেদ, ক্ষতি নেই তাই;
যেখানেই থাকো, সেখানে, দীপ্ত মুখে,
স্বপ্নকে দিও আঁধার শয়নে ঠাঁই ॥

আমার কি কোনোও স্বপ্ন আছে! ছিল। অনেক কামনা ছিল, এখন আঁধার আছে, শয়ন আছে, দুঃস্বপ্ন আছে।

ঘুমে বুজে আসে তোমার তরল আঁখি
বিবশ রসনা মানে না তথাপি মানা;
মিলনে যে-কটি কথা রয়ে গেল বাকি
অবাধ হয়েছে বিরহে তাদের হানা ॥

হাজার মাইল লম্বা একটা চিঠি লিখতে পারি মাধুকে; কিন্তু সই ডাকঘর কোথায়! মনেই লিখি, মনেই ছিঁড়ে ফেলি।

ঘুমাও, ঘুমাও, আরামে ঘুমাও তবে
আমার আশিসে তোমার শিয়র পূত ;
সংবৃত তুমি অধুনা যে গৌরবে,
আমি সে-রসে নিয়ত আবির্ভূত ॥

জীবিতের জগৎ থেকে মৃতের জগতে আমার নিয়ত আনাগোনা। কিন্তু কোনোও সাড়া তো পাই না।

কৃপণ গানের অমৃত সঞ্চয়নে
ব্যক্ত তোমার অনুপম পরিচিতি ;
বাসা বেঁধেছিলে আজ যে আলিঙ্গনে.
তাতে বারবার ফেরাবে তোমাকে স্মৃতি ॥

সেজেগুজে বসে আছি, রামু আসছে না। তাই মনে যত ঠুন্‌কো ভাবাবেগ আসছে। ভাবাবেগ ছাড়া, এ বয়েসে মানুষের আর কি আসতে পারে!

নটা বাজল রামুর এখনও পাত্তা নেই। ব্যবসাদারদের এই দোষ। কথার ঠিক রাখতে পারে না। অবশ্য সঠিক সময়টা সেদিন বলে নি। আমার মনটা ছুটছে বলেই দেরি অসহ্য লাগছে। কিছু করারও নেই যে মনটাকে ধরে রাখব।

দেখতে দেখতে এগারোটা বেজে গেল। না আর এ ভাবে বসে থাকা যায় না। কাছাকাছি কোনোও একটা জায়গা থেকে রামুকে একবার ফোন করি। টেলিফোনের কথাটা কেন যে এতক্ষণ মনে আসে নি! মনের তিনের-চার অংশ মরে এসেছে।

রামুর ফোন বেজেই চলেছে। এ আবার কি! যার অত বড় অফিস! টেবিলে নানা রঙের চার পাঁচটা ফোন, একাধিক কর্মচারী, তার ফোন বেজে যাবে, কেউ ধরবে না! এমন তো হয় না। হতে পারে না। রিসিভার নামিয়ে রেখে, আবার ডায়াল করলুম। এবারেও সেই একই ব্যাপার। নিরন্তর বাদ্য। থেমে থেমে বেজেই চলল। অনন্তে বেজে চলেছে আমার আহ্বান।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়লুম রামুর অফিসের উদ্দেশ্যে। আশ্চর্য ব্যাপার অফিসে তালা মারা। এ আবার কি খেলা! তলে তলে রামুর অনেক ব্যাপার। আবার পুলিশে ধরল না কি! বলা যায় না। এমনও হতে পারে, গোলমাল বুঝে রামু

গা ঢাকা দিয়েছে! নেমে আসছি, সিঁড়িতে একজন জিজ্ঞেস করলেন, কাকে খুঁজছেন ?

ভদ্রলোক বাঙালী।

রামবাবুর অফিস আজ বন্ধ কেন ?

বিস্মিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, আপনি জানেন না !

কি বলুন তো ?

কাগজ পড়েন নি !

কাগজ পড়া বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি। কি হবে কাগজ পড়ে। বললুম, না, পড়ি নি তো !

কাল রাতে, খিদিরপুর জেটির কাছে রামবাবু খুন হয়েছেন।

সে কি ?

হ্যাঁ, একেবারে শেষ। আপনার কিছু পাওনা ছিল না কি ?

না।

যাক বেঁচে গেছেন।

ভদ্রলোকের মুখে চোখে কোনোও দুঃখ নেই, বেদনা নেই। সিঁড়ি ভেঙে ওপর দিকে উঠতে লাগলেন। মানুষ আজকাল এই রকমই হয়ে গেছে। যাঃ রামু খুন হয়ে গেল! কি আশ্চর্য! আমি এত অপয়া! গিরিডি, মেয়ের চিন্তা সব মাথা থেকে উবে গেল। রামুকে একবার শেষ দেখা দেখতে ইচ্ছে করছে। আমার বহু বিপদের বন্ধু। রামু এখন কোথায়! হাসপাতালে! মর্গে! নাকি শ্মশানে!

জনাকীর্ণ কলকাতার রাস্তা। শহর ছুটছে দিগ্‌বিদিকে। ফুটছে টগবগ করে। রামু এক সামান্য প্রাণ। পয়সা ছিল, নিজের ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি ছিল। আর তো কিছু ছিল না যে মানুষ কাতারে কাতারে ছুটে আসবে ফুল আর মালা নিয়ে!

এক ফলওয়ালার পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম চুপ করে। কাঁচ কাঁচ শসা উঠেছে কলকাতায়। কমলালেবুর ছড়াছড়ি। রামু খুন হয়ে গেল! এত বড় ব্যবসা, এত পয়সা, এত প্রতিপত্তি। সব ফুস হয়ে গেল! এক ফুঁয়ে বাতি নেভাবার মতো! হায়রে! মানুষের জীবন! আমি লোকটা কি ভীষণ অপয়া! যখন যেদিকে তাকাচ্ছি, সেই দিকটাই জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। যাকেই সঙ্গী

করার জন্যে হাত বাড়াচ্ছি, সেই চলে যাচ্ছে সীমানার ওপারে। রামুর মুখ চোখের সামনে ভাসছে।

সামোসা খাও ভাই সামোসা।

শেষ খাওয়া খাইয়ে গেল সেদিন।

দুপুরে, একা বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবলুম, কি করা যায়! একাই বেরিয়ে পড়তে হবে। কে আর আছে আমার, যাকে লেজুড় করে নিয়ে যেতে পারি। গৌরীর সঙ্গে একসময় বিপ্লবের খুব মাখামাখি ছিল। ছেলে ভালো নয়। চরিত্রের চ-ও নেই। তবে এই রকমই তো এখনকার কালের রীতি। জিও, পিও। আমার ভালো লাগে না। আমি সেকেলে মানুষ। মেয়ের সঙ্গে মাখামাখি ছিল, গাত্রজ্বালার সেটাও একটা কারণ।

বিপ্লব তো আমাদের সেই পুরনো পাড়ায় থাকে। একবার গিয়ে বলে দেখব! এতখানি ঠেঙিয়ে যাব তারপর যদি না বলে! অনেক কাল আগে, একদিন স্কাউনড্রেল বলে গালাগালি দিয়েছিলুম। আমার সামনেই গৌরীর সঙ্গে খুব ফষ্টিনষ্টি করছিল। এমন একটা উপেক্ষার ভাব, যেন বাপ আবার কি বস্তু! মেয়ে, মেয়ের যৌবন আর আমি এক উদ্দাম যুবক, পৃথিবীতে আর কিসের প্রয়োজন। তুই ব্যাটা বুড়ো, তুই তো নিমিত্তের ভাগী। ঘুড়ি তুমি উড়িয়েছ, আমি প্যাঁচ খেলে কেটে, লটকে নিয়েছি। ভোম্‌মারা।

তবু মন বলছে, যা না একবার বিপ্লবের কাছে। ডাকাবুকো ছেলে। রাজি হয়ত হয়েও যেতে পারে। বলা যায় না, প্রেমের ছিটেফোঁটা এখনও হয়ত মনের বাথরুমে শ্যাওলার মতো লেগে আছে। কি থেকে কি হয়ে যায়, কে বলতে পারে! জীবন নিয়েই তো উপন্যাস। বিপ্লবের মতো একটা ছেলে পাশে থাকলে, লোক-বল বাড়ে, সাহস বাড়ে। গিরিডিতে এমন কিছু ঘটতে পারে যে ঘটনায় পিতার হয়ত সরে থাকাই উচিত। খুবই নোঙরা কোনোও ব্যাপার। না আমি আর ভাবতে পারছি না। বিপ্লবের কাছে আমি একবার যাই। এতদিনে হয়তো ভুলেই গেছে, অনেকদিন আগে কি বলেছি না বলেছি!

বিপ্লবদের বাড়ির ভোল পালটে গেছে। পুরনো বাড়ির খোলস খুলে ফেলে দিয়েছে। নতুন পলেস্তারা উঠেছে গায়ে। আজ-

কালকার সিমেন্ট রঙে ঝকঝক করছে। আশেপাশে হাত পা মেলেছে। সবুজ রঙের নতুন একটা গাড়ি রাস্তার ধারে ঝিমোচ্ছে। সেই সাবেক কালের ফাটাফুটো দরজার বদলে, নতুন পালিশ করা দরজা বসেছে। পাশেই কলিং-বেল। লেটার-বক্স্। গায়ে সাদা অক্ষরে লেখা বিপ্লব বসু। ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট।

রাতারাতি মানুষের কত কি পালটে যায়!

রাজ হ্যায় রাজ হ্যাঁয় তকদির জহানে তস ও তাজ
জোশে কিরদারসে খুল জাতে হ্যাঁয় তকদিরকে রাজ॥

আসল কথা এই—ভাগ্য আবার কি? কর্মেরই জগৎ। মানুষের বীর্যেই খুলে যায় সৌভাগ্যের গোপন দরজা। সাবাশ! বিপ্লব বসু! এত বড় বাড়ি! বড় নির্জন। পূর্বপুরুষরা সবাই বোধহয় মরে হেজে গেছে। একা বিপ্লব দেউড়ি আগলাচ্ছে। কিছু আশ্চর্য নয়। হতে পারে। কতকাল পরে আসছি!

ভয়ে ভয়ে কলিং-বেলে হাত রাখলুম। অনেক অনেক দূরে গম্ভীর একটা শব্দ বেজে উঠল, ডিং ডং। আমার বিবেকের শব্দ। স্বার্থের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিতে ফিরে আসছে। ভেতরটা কেমন যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। কেন এলুম, কেন এলুম!

একটু অপেক্ষা করে আবার কলিং-বেলে আঙুল ছোঁয়ালুম। আবার সেই শব্দ ভাসতে ভাসতে সুদূরে চলে গেল। কোথাও একটা দরজা খোলার শব্দ হলো। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। অবশেষে দরজা খুলে সামনে যিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁকে বিপ্লব বলে চিনে নিতে বেশ কিছু সময় লাগল। সময় আমাদের দু'জনেরই চেহারায় পরিবর্তন এনেছে। আমার ভেঙেছে। বিপ্লবকে গড়েছে। কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে। চেহারায় বয়েসের বাঁধুনি এসেছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

বিপ্লব চিনেছে ঠিক। মানুষ ভাঙলেও পরিচয় একেবারে মুছে যায় না। একটা কিছু থেকে যায় শরীরে যা দেখে সনাক্ত করা চলে। হয় নাক, না হয় চোখ, অথবা কান, কণ্ঠস্বর। আমার কান দুটো হাতির মতো। নাকটা বাজপাখির মতো, সামনের দিকে বাঁকা।

বিপ্লব বলল, মেসোমশাই, আপনি, হঠাৎ, এই সময়!

ভেতরে চলো।

আগেও একবার দু'বার বিপ্লবদের বাড়িতে এসেছি। আসতুম তাকে শাসাতে। তখন বাড়ির ভেতরটা ছিল সাবেক কালের মধ্যবিত্তদের মতো। এলোমেলো, অবিন্যস্ত। জিনিসপত্রের যেখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকার অবাধ-স্বাধীনতা। এখন একেবারে উলটো। চারপাশে ঐশ্বর্য যেন সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলায় কুচকাওয়াজ করছে। সোফা, সেটি, ডিভান, ঝাড় লণ্ঠন। মসৃণ দেয়াল রঙের আলতো স্পর্শ।

একপাশে ভয়ে ভয়ে বসলুম। এত শৃঙ্খলায় আমার মতো ছন্নছাড়ার বসাটাও বিশৃঙ্খলা। সোফায় সামান্য তফাতে বসে বিপ্লব বলল, কি খবর মেসোমশাই ! কোনো বিপদে পড়েছেন ?

ছেলেটা একেবারেই বদলে গেছে। কথাবার্তায় আগের সেই অসভ্যতা নেই, কর্কশতা নেই। চেহারায় বেশ একটা আভিজাত্য।

হ্যাঁ বাবা, বিপদে পড়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি আমার আগের ব্যবহার মনে রাখ নি তো ! বিপ্লব হো হো করে হেসে উঠল। হাসিটা আগের মতোই আছে। তার মানে ভেতরে এখনও প্রাণ আছে। আমার মতো শুধু অভ্যাসে বেঁচে নেই।

হাসি থামিয়ে বিপ্লব বললে, মেসোমশাই অতীতকে মানুষ যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারে ততই ভালো। যেটুকু মনে না রাখলেই নয়, সেইটুকু রেখে বাকিটা ফেলে দিতে হয়। বলুন আপনার বিপদটা কি ?

বিপদ আমার একটাই বিপ্লব। সেই বিপদ হলো আমার মেয়ে।

কেন মেসোমশাই ? গৌরীর তো বিয়ে হয়ে গেছে।

সে তো তুমি জানই বিপ্লব, কি বিয়ে, কেমন বিয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে ! তুমি তো সবই জান।

জানি মেসোমশাই। এও জানি, ওসব ছেলে বেশি দিন বাঁচে না।

টেলিফোন বেজে উঠল। বিপ্লব কথা বলছে। কার সঙ্গে বলছে তা বোঝা না গেলেও, যা বলছে তা শুনতে পাচ্ছি। মনে হয় কোনোও বিদেশীর সঙ্গে কথা বলছে। বেশ ভারি ভারি কথা। কথায় অর্থনীতি, সমাজনীতি, গণিত সব মিশে আছে। বিপ্লব

আর সে বিপ্লব নেই। ওর সামনে এখন নিজেকেই ছোট মনে হচ্ছে। অলরাইট, আই উইল সি ইউ টুমরো। বিপ্লব ফোন রেখে আবার আমার পাশে এসে বসল। বসে বললে সরি। আপনাকে বসিয়ে রেখেছি। সামনের মাসে আমি ভিয়েনা যাচ্ছি। প্রফেসর মায়ার ফোন করেছিলেন।

বিপ্লব কোথাও একটা হাত রেখেছিল, আবার সেই ঘণ্টা বেজে উঠল।

ঘরে একজন মহিলা এলেন, বিপ্লব দু'কাপ চা দিতে বলল।

মেসোমশাই যদি অনুমতি দেন, একটা সিগারেট ধরাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় ধরাবে।

আপনার চলবে ?

না বাবা। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছি। মাঝে মাঝে রাতের দিকে হাঁপের টান উঠছে।

বিপ্লব সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, গৌরী কেন যে হঠাৎ কমলের সাথে বেরিয়ে গেল ! মেয়েদের মাথায় যে কি থাকে দেখতে ইচ্ছে করে। একটা থার্ডক্লাস ক্রিমিন্যাল টাইপের ছেলে। যাক, যা করে ফেলেছে !

সেই কমল এখন গৌরীকে নিয়ে গিরিডিতে গিয়ে উঠেছে। সেখানে একে তাকে ধাপ্পা দিয়ে, টাকা পয়সা মেরে, গৌরীকে ফেলে পালিয়েছে। এদিকে পাওনাদাররা গৌরীকে ছেঁকে ধরেছে। শুধু ধরে নি, তাকে বেইজ্জত করার চেষ্টা করেছে। এই দেখ চিঠি।

চিঠিটা বিপ্লবের হাতে তুলে দিলুম। ধীরে ধীরে পুরো চিঠিটাই পড়ে ফেলল। চা এসে গেছে। অন্যমনস্ক চায়ে চুমুক দিচ্ছে, আর চিঠি পড়ছে। আমি একদৃষ্টে মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। উদাস মুখে চিঠিটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। ঠোঁটের কাছে চায়ের কাপ।

অনেকক্ষণ পরে বললে, কি করতে চান ?

যেতে চাই, মুখে আমরা যতই বলি না কেন, সন্তানের প্রতি উদাস হওয়া যায় না। যতদিন বাঁচা যায় অদৃশ্যে একটা বন্ধন থেকে যায়।

আমার কাছে এলেন কেন ?

তোমার সাহায্য চাইতে। আমার তো কেউ কোথাও নেই। বয়েস হয়েছে। শক্তি নেই, সাহস নেই। পৃথিবীর চেহারাটাও বড় বদলে গেছে। আর কোমল নেই। বড় কঠিন মনে হয়, বড় নির্দয়।

আপনি কেমন করে ভাবলেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? ওই গৌরীর জন্যে আমার অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে।

অতীতের জন্যে বর্তমানে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইব না। সে সময় আমি যা করেছি, সব বাপই তা করত। তুমি পিতা হলে বুঝবে। আমার মনে হলো তুমি আমাকে ফেরাবে না।

মন আপনার ঠিকই বলেছে মেসোমশাই। গৌরীকে সত্যিই আমি ভালোবাসতুম। আপনার সামনে এসব কথা বলা আমার উচিত নয়, তবু বলছি। আপনারও বয়েস বেড়েছে। আমি এখন অনেক চালাক হয়ে গেছি। বুঝতে শিখেছি, পৃথিবীতে সেন্টি-মেন্টের কোনোও দাম নেই। এ হলো লেনাদেনার জায়গা। তাহলে চলুন. আজই বেরিয়ে পড়ি।

কি ভাবে যাবে?

কেন? ট্রেনে যাব। অনেক ট্রেন আছে। মধুপুর থেকে চেঞ্জ করে নেবো। দাঁড়ান টাইমটেবিলটা দেখে নি।

তুমি বিবাহ করেছ বিপ্লব?

না মেসোমশাই। ও কাজটা এবার আর করা হলো না। তোলা রইল সামনের বারের জন্যে।

মধুপুর স্টেশনে শেষ রাত্রে আমরা ট্রেন থেকে নামলুম। বেশ শীত। বুদ্ধি করে কানচাপা একটা হনুমান টুপি কিনে নিয়ে-ছিলুম। কানটা চাপা দিতে পারলে শীত অনেক কমে যায়। স্টেশনের বাইরে যাবার কোনোও প্রয়োজন নেই। সকাল আটটার ট্রেনে গিরিডি যাত্রা। এই সময়টুকু কাটাতে পারলেই হলো। সঙ্গে আমাদের কোনোও মালপত্র নেই। একেবারেই ঝাড়া হাত-পা। যা আছে সবই আমাদের সাইড ব্যাগে। গিরিডিতে বিপ্লবের চেনা-শোনা হোটেল আছে হয়ত।

বিপ্লব বললে, চলুন স্টেশনের বাইরে গিয়ে চা খেয়ে আসা যাক।

আমাদের সঙ্গে আর একটি পরিবারও ট্রেন থেকে নেমেছিলেন। দেখেই মনে হয়েছিল চেঞ্জারবাবু। কর্তাটি আমার মতোই বয়স্ক মানুষ। বাইরে চা খেতে যাবার প্রস্তাব শুনে বললেন, নাই বা বাইরে গেলেন। সে দিনকাল আর নেই। এদিকে আমার আসা-যাওয়া আছে। চোখের সামনে দেখছি, দিন দিন, কিভাবে অবস্থার অবনতি ঘটছে। যেই স্টেশনের বাইরে যাবেন অমনি সব ছিনতাই হয়ে যাবে। এই তো আমরা বাহান্ন বিঘের দিকে যাব, অপেক্ষা করছি, দিন ফুটলে তবে যাব।

ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূর দিকে চলে গেলেন। বিপ্লব বললে, শুধু শুধু ভয় দেখিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। আমি বললুম, শুধু শুধু কেন ভয় দেখাবেন ? দেখছ না উনি নিজেও অপেক্ষা করছেন। এক সময় মধুপুরে কলকাতার একাধিক বড়লোক বাঙালীর বাড়ি ছিল। শীতের সময় চেঞ্জারবাবুরা, মধুপুর সরগরম করে তুলতেন। এখন অবস্থা দেখ ! কি দরকার, স্টেশনেই চা খাও না।

বিপ্লব একটু ক্ষুণ্ণ হলো। অহঙ্কারে লেগেছে। বললে, আপনি থাকুন, আমি একবার ঘুরে আসি। আপনার আশীর্বাদে গোটা দুয়েকের মহড়া একাই নিতে পারব।

বুঝলে বিপ্লব, এই হলো যৌবনের দোষ ! তোমরা অবশ্য বলবে গুণ। এই হিসেবের অভাবে গৌরী ভেসে গেল। আর তো ঘণ্টাখানেক পরেই ভোরের আলো ফুটে যাবে। এসো না কেন মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে পড়ি এই বেঞ্চিতে। চারপাশ কেমন হু হু করছে। বসে বসে দেখি রাত কেমন তরল হয়ে আসছে।

বিপ্লব বললে, আমার অত কাব্য আসে না মেসোমশাই। এই দেখুন আমি নিরস্ত্র নই, সশস্ত্র। একটা লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছি। এখানেই যদি শুরু হয়ে যায় মন্দ কি ?

বিপ্লবের পকেটে একটা রিভলবার। খেলনা নয়, সত্যিই রিভলবার। ছ ঘরে ছটি মৃত্যুর পরোয়ানা। বিপ্লবকে রোকা গেল না। যে যাবে সে যাবে। এ যুগ বাধ্যতার নয়, অবাধ্যতার। বুড়োকে শীতের প্রায় নির্জন প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে বিপ্লব চলে গেল। উত্তুরে হাওয়া বইছে হু হু করে। রেলের গাঢ় নীল

ইউনিফর্ম পরা একজন মানুষ, হাতে একটা লাল লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে, লাইন পেরিয়ে এ প্ল্যাটফর্ম থেকে ও প্ল্যাটফর্মে চলে গেল। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক শাল মুড়ি দিয়ে দূরে পায়চারি করে শীত কাটাচ্ছেন। ট্রেন যখন থেমেছিল তখন দু'একটা চা-গরম চোখে পড়েছিল, এখন তারা অদৃশ্য।

বিপ্লব যত দেরি করছে ততই আমার উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছে। কান খাড়া করে বসে আছি। দুম করে আওয়াজ পেলেই ছুটব। না, আওয়াজ আসছে না, চারপাশে শনশন করছে বাতাসের শব্দ। বিপ্লব ফিরে এলো। হাতে একটা ঠোঙা।

নিন মেসোমশাই, গরম কচুরি আর জিলিপি খান।

সে কি, তুমি আমার জন্যে নিয়ে এলে! আমার যে দাঁত মাজা হয় নি।

ধুর মশাই, ঘুমোলেন কখন যে দাঁত মাজবেন! দাঁত তো বাসীই হলো না।

তাহলেও!

তাহলে ফাহলে ছেড়ে খেয়ে নিন, একেবারে টাটকা গরম। এরপর দু'জনে চা খেতে যাব। বাইরেটা ভারি সুন্দর।

অনুরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে। এ তো সুস্বাদু কচুরি আর জিলিপি! দু'জনে পাশাপাশি বসে খেতে শুরু করলুম। এত ভোরে জীবনে একদিনই খেয়েছিলুম। সে ছিল শীতল খাদ্য—দই আর চিঁড়ে। খেয়েছিলুম আমার বিয়ের দিন সকালে। সারাদিনের উপবাসকে ফাঁকি দেবার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

বিপ্লব বললে, মানুষ ভয়েই আধমরা। স্টেশনের বাইরে সন্দেহজনক চরিত্রের কাউকেই দেখলাম না। কবে কি হয়েছিল সেই গুজবেই মানুষ ভয়ে মরছে। নিন, উঠুন, চা খেয়ে আসি।

যেতে পা সরছে না, তবু যেতে হলো, পাছে ভীতু ভাবে।

সত্যি বাইরেটা বড় সুন্দর। রাস্তা চলে গেছে সোজা। এক পাশে গোটা-চারেক নিদ্রিত টাঙা। বিশাল একটা গাছের পাতায় পাতায় অন্ধকার বাদুড়ের মতো ঝুলছে। চায়ের দোকানে কান ঢেকে বসে আছে ভোরের খদ্দের। দু-গেলাস চা নিয়ে আমরা পাশাপাশি বসলুম। দূরের রাস্তা দিয়ে একটা লরি চলে গেল।

অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে। হেডলাইটের আলো দুটোকে মৃত দৈত্যের চোখের মতো দেখাচ্ছে।

জানো বিপ্লব, এই মধুপুরে আমার জীবনের অনেক স্মৃতি এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে।

আপনার জীবনের কতটুকু আমি জানি বলুন! জানতে দিলেন কই?

ওই পাশে, ওই রেললাইনের ওধারে একটা রাস্তা আছে, নরেন্দ্র ঘটক রোড। এঁকেবেঁকে বহু দূর চলে গিয়ে একটা উঁচু জায়গায় শেষ হয়েছে। শেষ মাথায় একটা সুন্দর বাগানবাড়ি ছিল, এখনও মনে হয় আছে।

মধুপুরে আমি কখনো আসি নি মেসোমশাই। ঝাঁঝায় গেছি, শিমুলতলায় গেছি, মধুপুরে এই আমার প্রথম আসা।

সেই বাড়িটায় প্রায় প্রতি বছরেই আমরা আসতুম। গৌরী তখন খুব ছোট। সেই বাড়িটা একবার দেখতে ইচ্ছে করে, আর কি আসা হবে! বেশ বুঝতে পারছি, আমার যাবার সময় হয়েছে।

এখনও অনেক সময় আছে। চলুন, একটা টাঙা নিয়ে দেখে আসি। সময়টা বেশ কেটে যাবে। ক্ষোভ থাকে কেন?

আকাশে আলো ফুটছে। অজস্র পাখি ডাকছে। একবার দেখে এলে হয়! চেঞ্জে এসে, ভোরেই তো বেড়াতে বেরতুম। শীতকাল, গৌরীর মাথায় নীল স্কার্ফ, মাথায় এক মাথা সোনালী সোনালী চুল। সাদা ফুলহাতা নরম নরম সোয়েটার। গৌরীর মায়ের গায়ে ফুলহাতা ফিকে গোলাপী সোয়েটার। লালের দিকে তার একটা ঝোঁক ছিল। জীবনরসিক তো জীবনটাই শেষ হয়ে গেল কত তাড়াতাড়ি।

ঠকাস্ করে বেঞ্চিতে গেলাস নামিয়ে বিপ্লব বললে, চলুন তাহলে। ভয় কেটে গেছে। ওই দেখুন, আপনার ভয় দেখানো ভদ্রলোক সপরিবারে টাঙায় উঠছেন।

চলো তাহলে।

টাঙাঅলার মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরচ্ছে। বেশ শীত পড়েছে। ভাড়া ঠিক করে ওঠা গেল। বিপ্লব বললে, ভালো করে চাপা দিয়ে বসুন। বেশ ঠাণ্ডা। শরীর না খারাপ হয়। শালটা ভালো

করে মাথায় জড়িয়ে নিন।

বিপ্লব যেন আমার ছেলের মতো। গৌরী কি ভুলই করেছে! গৌরী করেছে, না আমরা করেছি। কে জানত বিপ্লব এমন পালটে যাবে! কিংবা তখন আমাদেরই বুঝতে ভুল হয়েছিল!

টাঙা ছুটছে দুলকি চালে। জীর্ণ ঘোড়ার ভোরের আলস্য এখনও কাটে নি। চালকও নিদ্রাতুর। চারপাশে বেশ বদলে গেছে। ডাকবাংলোর উল্টো দিকে সেই অ্যাঙলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের কুটিরটি এখনও আছে। সেই বুড়ো বুড়ি আর নেই। কি করে থাকবে! কত বছর আগের কথা। ছোট্ট খাটিয়ায় মশারির মধ্যে একজোড়া কুকুর শুয়ে থাকত। কুকুরের পরমায়ু তো মানুষের চেয়ে অনেক কম।

সেই বিশাল বটবৃক্ষ এখনও কালের সাক্ষী হয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। ঝুরিগুলো কাণ্ডে পরিণত হয়েছে। দুপুরে রোদভরা মাঠে গৌরী প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে বেড়াত। বটের শিকড়ে আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতুম, গর্বে বুক ভরে যেত। কোথায় চলে গেল সে সব দিন। মানুষ যাদুঘরে অতীতকে সাজিয়ে রাখে, চলে যাওয়া সময়কে কেন পারে না! গাছে পাতা ঝরে আবার পাতা আসে সবুজ হয়ে। জীবন থেকে মুহূর্ত ঝরে পড়ে যায়। যাহা যায় তাহা যায়।

বিপ্লব বললে, জায়গাটা বেশ ভালো তো!

আগে আরও ভালো ছিল। শীতের সময় কতো চেঞ্জার আসত। বাঙালীর তো আর সে বোলবোলা নেই। দু'পাশে সারিসারি বাড়ি, ভগ্নপ্রায়। এক সময় সাজান বাগান ছিল। এখন অযত্নে, অনাদরে জঙ্গল। সেকালের মাথাউঁচু কর্তাদের মতো খাড়া খাড়া ইউক্যালিপটাস। অধিকাংশ বাড়িরই মার্বেল পাথরের ফলক বিবর্ণ। কত বিচিত্র, কাব্যিক নাম ছিল সব। গেটের মাথায় মাধবীলতা ভোরের বাতাসে দুলছে। মাধবীর বড় কড়া জান। সহজে মরে না।

আমরা সেই শেষ বাড়িটায় এসে পড়লুম। যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই। কতকাল কেউ আসে নি। টাঙা থামল। বিপ্লব লাফিয়ে নামল। হাত ধরে আমাকে সাবধানে নামাল।

এই সেই বাড়ি।

এই সেই বাড়ি ?

গেটে চেন সমেত বিরাট এক তালা ঝুলছে। মরচে ধরে হলদে হয়ে গেছে। সে যুগের লোহা। গেটটা তাই এখনও আস্ত আছে। হাঁটুভরা আগাছা।

বিপ্লব বললে, সাবধান মেসোমশাই, সাপখোপ থাকতে পারে।

এই শীতে সাপ বা বিছে কিছুই থকেবে না বিপ্লব, তবে বাঘ থাকতে পারে।

মার্বেল ফলকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। লেখা মুছে গেছে। খুব ভালো করে দেখলে খোদাই থেকে বোঝা যায়, এক সময় লেখা ছিল, আনন্দ ভবন। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। আনন্দ ভবনে আর আনন্দ নেই। গেটের ফাঁক দিয়ে বাগানের যতটা দেখা যায়, কেয়ারী ফেয়ারি সব অদৃশ্য। মানুষসমান বুনোগাছ সব কীর্তি ঢেকে দিয়েছে। সাদা পাথরের গোটাকতক মূর্তি আরও সাদা হয়ে আগাছায় আত্মগোপন করে আছে। মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। কিভাবে জানি না, একটা সাদা গোলাপ বেঁচে আছে। একজোড়া ফুল ফুটে আছে। কেউ দেখুক না দেখুক, অসীম নির্জনতাকে সাজাতে চায়।

জানালা দরজার সমস্ত কপাট খুলে নিয়ে গেছে। বাড়িটার চতুর্দিক যেন হাহা করে হাসছে। সে হাসির অর্থ, কিছুই থাকবে না, কিছুই থাকে না। একপাশের পাঁচিল ভেঙে পড়ে গেছে। সার সার ইউক্যালিপটাস গাছ। তেলা শরীরে এক ধরনের শ্যাওলা জমেছে।

বিপ্লব বললে, ভেতরে যাবেন মেসোমশাই ?

কি ভাবে ? গেটে তো তালা।

থাক না তালা। ওপাশের পাঁচিল তো ভেঙে পড়ে আছে। বাড়িটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। ভেতরে বিশাল একটা হলঘর আছে। পেছনটা আরও সুন্দর। বিশাল বাগান, টিলার ওপর থেকে নিচে ঝুঁকে আছে। বিরাট একটা ইঁদারা, চার-পাশ বাঁধান ছিল। জল ছড়িয়ে পড়ার নালি কাটা ছিল সার সার। এখন আর কিছুই হয়ত নেই।

চলুন না যাই।

কোথায় যাবে ? সবই তো জঙ্গলে ঢেকে গেছে।

এ জঙ্গল তো ভালো জঙ্গল মেসোমশাই। কাঁটা গাছ নেই।

চলো তাহলে। কেউ আবার কিছু বলবে না তো ?

দু'দশ মাইলের মধ্যে বলার মতো কেউ আছে কি ?

টাঙাঅলা বসে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। বিপ্লব তাকে একটা দামী সিগারেট দিয়ে বললে, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমরা আসছি।

ইয়ে আপকা কোঠি ?

থা, আভি নেহি।

কেয়া জমানা আ গিয়া জি। ডাকুকা জমানা। তিন কিসিমকা ডাকু হ্যায়, সফেদ, লাল অওর কালা।

ক্যায়সা ?

সমঝ লিজিয়ে।

বাতাইয়ে। হামারা সমঝ মে আতাই নেহি।

সফেদ, উয়ো পহেলে থা, যিন লোগোনে হামকো আজাদি দে চুকা, আভি বরবাদ হো গিয়া। লাল, উয়ো লোক মঠ বানাতা, রাম নাম লাগাতা, লেকিন যিনকা কাম হায় কামাই। কালা, হর চিজ যিনকা গুদাম মে যাতা, লেকিন আতা নেহি, কালা রুপাইয়াসে কোঠি বনাতা, রঙ লেতা। যাইয়ে বাবুসাব। হাম ইধারি হ্যায়, ঘাবড়াইয়ে মাত।

পাঁচিলের ভাঙা অংশ টপকে আমরা দু'জনে ভেতরের জঙলা অংশে ঢুকে পড়লুম। কোমর সমান গাছপালা! কাপড় টেনে ধরছে। বলতে চাইছে, আহা আর এগিও না, কেন অতীতকে খুঁচিয়ে জাগাতে চাইছ ? ঘুমোচ্ছে ঘুমোক না। এখন দেখছি আমার চেয়ে বিপ্লবের উৎসাহই যেন বেশি।

সান বাঁধান সেই রক এখনও ঠিক সেই রকমই আছে, যেমন ছিল আজ থেকে এক যুগ আগে। এই রকে পাশাপাশি দু'জনে বসে থাকত শীতের দুপুরে গৌরী আর তার মা। তখন কেয়ারী করা বাগান ছিল। বাগান দেখাশোনার জন্য দেশীয় মালি ছিল।

হলঘরের মেঝে খুঁদলে সমস্ত পাথর তুলে নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই চোরের কাজ। চামচিকের বাসা হয়েছে। ওপাশের গন্ধরাজ গাছ এখনও আছে, পাঁচিলের দিকে পিচফলের গাছে ফল এসেছে।

গৌরীর খুব প্রিয় ছিল। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, মেয়েকে কোলে নিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরের বাতাস বয়ে চলেছে হু হু করে।

অতীত তুমি ফিরে এসো, বললেই অতীত ফিরে আসত! সে ক্ষমতা তো মানুষের নেই। ভেতরের একটা ঘরে দেয়ালের কোণে খাড়া হয়ে আছে একটা কারুকাজ করা ছড়ি। ময়লা পড়েছে, ঝুলে ঢেকে গেছে। কোনোও কালে কেউ এসেছিলেন, ভুলে গেছেন। ভেতরের দালানের একপাশে দু'পাটি হাই হিল জুতো পড়ে আছে। শুকিয়ে কাঠ। কেন আছে? এ জুতোর পা এখন কোথায়! কোন শহরে? জীবিত না মৃত! ইঁদারার পাড়ে দাঁড়িয়ে বিপ্লব বললে, বাড়িটা আমি কিনে ফেলব মেসোমশাই। অবসর নিয়ে আপনি এখানে এসে থাকবেন। চারপাশ কি সুন্দর ফাঁকা। দূরে ওটা কি নদী? পাথরোল।

মধুপুর থেকে গিরিডি মাত্র কয়েকটা স্টেশন। বহুবার মধুপুরে এসেছি, গিরিডি এত কাছে, তবু একবারও আসা হয় নি। বহুবার ভাবা হয়েছে উশ্রী ফলস দেখব। দেখা হয় নি। প্রথমে যত উৎসাহ নিয়ে চেঞ্জে আসা হয়, শেষের দিকে সব এলোমেলো হয়ে যায়।

বিপ্লব হঠাৎ যেন আমার মনের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। এত কাছে, যেন নিজের ছেলে। শুনেছি, যে মানুষ প্রথম দিকে কিছু পায় না সে শেষের দিকে এমন কিছু পায় যে মন ভরে ওঠে। তখন মরতে মন কেমন করে। ট্রেনে আরও দু'বার চা খাওয়া হলো। রাতে ঘুম না হলেও শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। আমাদের সহযাত্রীরা বেশীর ভাগই সাঁওতাল স্ত্রী পুরুষ। লাঠি-সোঁটা, পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে টিয়ে নিজেদের জগৎ তৈরি করে বসে আছে।

গিরিডিতে নেমে আমরা যেন একটু দিশেহারা হয়ে পড়লুম। একেবারে অচেনা শহর। কোথায় যাব কোথায় থাকব, কিছুই জানা নেই। চারপাশে মাড়োয়ারী ব্যবসাদাররা গিজগিজ করছে। অভ্রের ব্যবসা একচেটে এদের হাতে। কোনোও কালে বাঙালীর হাতে ছিল কি না কে জানে।

স্টেশনের বাইরে এসে আবার আমরা একটা টাঙা নিলুম। এবার বেশ তেজী ঘোড়া। টাঙার চেহারাটা বেশ ভদ্রগোছের। মধুপুর পোড়ো শহর। সবকিছুই যেন জরাজীর্ণ। টাঙাঅলাও বেশ যুবক। হিন্দী গানের সুর ভাঁজছে আপন মনে।

বিপ্লব বলেছে, একটা ভালো হোটেলে নিয়ে যেতে। এ শহরে ভালো হোটেল আছে কি? ব্যবসাদারদের শহর একটু নোঙরা হবেই। রাস্তাঘাটের তেমন শ্রী নেই। কেমন যেন চাপা। প্রয়োজনে সব গজিয়ে উঠেছে। বিপ্লব বললে, গৌরীর কাছে কখন যাবেন? দিনে না রাতে?

তুমি বল।

কি অবস্থায় আছে? কি ধরনের বিপদের মধ্যে আছে তা তো জানি না। যদি এমন হয়, তাকে চুপিচুপি নিয়ে পালাতে হবে, তাহলে রাতের দিকেই যাওয়া ভালো।

কত রাত? মাঝ রাত না শেষ রাত?

শেষ রাতই ভালো।

তার আগে একটু খোঁজ-খবর নেবে না?

সে আমি ঠিকই নোব। একটু পরেই বেরুবো। দু'চারজনের সঙ্গে আলাপ জমাব। অলিতে গলিতে ঘুরব। একটা সুবিধে, এখানে ব্যবসার খাতিরে অচেনা লোকের আসা যাওয়া আছে। নতুন মুখ দেখে কেউ তেমন সন্দেহ করবে না।

টাঙা একটা তিন তলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গায়ে লেখা হোটেল প্রাচী। সব হোটেলেরই কেমন একটা গন্ধ আছে, একটা উত্তাপ আছে। বাইরেটা ঠাণ্ডা, ভেতরটা গরম। দিনের বেলাও আলো জ্বলে। হোটেল দেখে বিপ্লব তেমন খুশি হলো না। কলকাতার মানুষের সহজে মন ওঠে না।

দোতলার কোণের দিকে একটা ঘর পাওয়া গেল। ম্যানেজারই জিজ্ঞেস করলেন, কদিন থাকবেন? আমার কথা বলার কোনোও প্রয়োজন হচ্ছে না। বিপ্লব আমার গার্জেন। বিপ্লব বললে, এখনই বলতে পারছি না। যে কাজে এসেছি, শেষ হলে কালই যেতে পারি। শেষ না হলে, দু'একদিন থাকতে পারি।

সন্ধের দিকে তিন তলায় একটা ভালো ঘর খালি হবে। ইচ্ছে

হলে সে ঘরেও যেতে পারেন।

খুব ভালো কথা! দেখি, কি হয়!

ম্যানেজার চলে গেলেন! একটু যেন বেশি খাতির করছেন। সে ওই বিপ্লবের চেহারার জন্যে। এ সব ছেলে যেখানে যাবে সেই-খানেই রাজা হয়ে বসবে।

বিপ্লব বললে, মেসোমশাই, আপনি গরম জলে চান করে, এক কাপ গরম চা খেয়ে একটা ঘুম দিয়ে নিন। শরীরটা বেশ ফ্রেশ লাগবে।

অত সহজে আমার ঘুম আসে না বিপ্লব। ঘুমকে আমি হত্যা করেছি।

সেই নিহত ঘুম আজ আমার কথায় আবার ফিরে আসবে!

একটু চেষ্টা করে দেখুন। জীবনের রেলগাড়ি বে-লাইনে চলে গেছে, আমি তাকে লাইনে তুলে দোবই, তা না পারলে আমার নাম বিপ্লব নয়।

আমার ছেলেও হয় তো এমন কথা বলত না। বিপ্লব তুমি এ বুড়োকে অবাক করে দিলে।

ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল মেসোমশাই। জীবন বিচিত্র ব্যাপার! উল্কার মতো কে যে কখন, কার আকর্ষণে ছুটে আসে। তারপর জ্বলে উঠে নিঃশেষে ছাই হয়ে যাওয়া। জগৎ জুড়ে কার খেলা যে চলেছে! শয়তান না ভগবান! তুমি ভগবান মানো বিপ্লব?

ইচ্ছে করে। পারি না। বড় নেশায় আছি মেসোমশাই। ঘোরে আছি। লাট্টুর মতো কেবল ঘুরছি আর ঘুরছি।

এক সময় আমার ঈশ্বরে খুব বিশ্বাস ছিল। সে আমার দুঃখের দিনে। তারপর একে একে সবই যখন হারাতে লাগলুম, নিদারুণ অভিমানে বিশ্বাসটা চলে গেল। হেঁকে বললুম, তুমি নেই, থাকলেও তুমি অন্ধ, তুমি কালা। জন্ম আছে, কারাগার আছে, মৃত্যু আছে। তুমি নেই।

আপনার চোখে জল এসে গেছে মেসোমশাই। যে চোখে জল আসে, সেই চোখেই ঈশ্বর আসেন। এ ব্যাপারে অত সহজে রায় দেওয়া চলে না। আমরা কতটুকু জানি? প্রতি মুহূর্তে আমাদের নিজেকে নতুন নতুন ভাবে আবিষ্কার। তর্কে এর সমাধান নেই।

বাথরুমের জানলা দিয়ে পরেশনাথ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বড় অদ্ভুত লাগছে। ঘণ্টা কয়েকের ব্যবধানে, কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি! কোথায় সেই এঁদো ঘর, পাশেই পানা পুকুর। বস্তি বাড়ি। গৌরীর কথা ভাবছি। হয়তো ঐ পাহাড়ের দিকেই থাকে। গৌরীর অতীত জীবন থেকে এই রকম কয়েকটা ঘণ্টা সরিয়ে নিতে পারলে, আজ হয়তো এত অসহায় হয়ে পড়তে হতো না। সামান্য একটু মোহ, অল্প একটু বেচাল জীবনটাকে কোথা থেকে কোথায় এনে ফেলেছে! জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস নেই। থাকলেও বুঝতে পারি না গৌরীর কোষ্ঠী দেখে আমার এক বন্ধু বলেছিল, জন্মের সময়টাকে যদি পাঁচটা মিনিট পেছনো যেত, তা হলে তোমার এই মেয়ে কি যে হতো, ভাবা যায় না, মাত্র পাঁচ মিনিট।

বেশ ঠাণ্ডা। তবে সত্যিই চানের পর বড় তাজা লাগছে। ঘরে বিপ্লব নেই। জামা কাপড় ছেড়ে বাথরুমে গেছে। স্তোত্র পাঠের শব্দ ভেসে আসছে। টেবিলের ওপর রুপোর ফ্রেমে বাঁধান শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি বের করে রেখেছে। ও, এই ছবি তার সঙ্গেই ছিল। এক প্যাকেট ধূপও আছে। সত্যি মানুষের কি পরিবর্তন। ও আজকে যা হয়েছে, সে কি ওই ঠাকুরের কৃপায়! হে কৃপাময়! তাই যদি হয়ে থাকে, এই শেষের কটা বছর আমাকে একটু শান্তি দাও। আমার জীবনের সব ফুটোফাটায় একটু তালি লাগাবার সুযোগ দাও।

চা আর সামান্য কিছু খাবার পর বিপ্লব বললে, মেসোমশাই আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন, আমি শহরটাকে একটু চিনে আসি। দূর থেকে, ওপর ওপর গৌরীর আস্তানাটা দেখে আসি।

চলো না আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

এক সঙ্গে দু'জনে গেলে লোকের চোখে পড়ে যাব। গৌরী যদি সত্যিই নজর বন্দী থাকে তা হলে বিপক্ষ আরও সতর্ক হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে, আমাদের হয়ত গৌরীকে নিয়ে পালাতে হবে!

বিপ্লব দেশে তো এখনও আইনকানুন আছে, ব্যাপারটা কতদূর আর গড়াতে পারে। কিছু পাওনাদার মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছে এই তো। কত টাকা?

ধরুন অনেক টাকা। দশ বিশ হাজার। এই সুযোগে অনেক

ভুয়ো পাওনাদার গজিয়ে উঠতে পারে। কি করে সামলাবেন তাদের। ওরা হয়ত একজোট হয়ে বসে আছে! টাকার রাস্তায় গেলে আমরা সামলাতে পারব না। ব্যাপারটা আমাকে আগে জানতে হবে।

আমরা তো সোজাসুজি পুলিশের সাহায্যও নিতে পারি।

ওদের ওপর খুব একটা বিশ্বাস রাখা যায় কি?

তা অবশ্য যায় না!

পুলিশ চলবে পুলিশের নিয়মে, ধনী ব্যবসাদাররা চলবে কেনা-বেচার নিয়মে। তা ছাড়া আপনার জামাই কতটা নিচে নেমে কোন্ অন্ধকার জগতে ঘোরাফেরা করছে তাও তো জানি না। আমি একবার ঘুরে আসি।

যাও তাহলে। আমি একা একা কি করি!

শুয়ে একটা ঘুম।

বিপ্লব চলে গেল। ছেলেটার ভালোমন্দ কিছু না হয়ে যায়! হে ঠাকুর!

হঠাৎ মনে হলো, আমিই বা এত ভয় পাচ্ছি কেন? ভয়টাকে ক্রমশই যেন বাড়িয়ে তুলছি। এই হলো মানুষের দুর্বলতা। আমিও তো হোটেলের বাইরে দু'চার পা ঘুরে আসতে পারি! এত সুন্দর একটা জায়গা! হয়ত কালই চলে যেতে হবে! আর তো আসা হবে না কোনোও দিন। আমার মতো মানুষ কি আর চেঞ্জে আসবে! জীবনে সঞ্চয়ের পালা শেষ হয়ে গেছে। এখন খরচের পালা, ফুরোবার পালা।

আমার সেই ঝলমলে পাঞ্জাবিটা গলিয়ে, গায়ে সেই বহু পুরনো শালটা চাপিয়ে নিচে নেমে এলুম। সামনেই রাস্তা। রাস্তার উল্টো দিকে একটা বড় গাছ, গাছতলায় দুটো টাঙা দাঁড়িয়ে আছে। সব শহরেই বেশ ব্যস্ত সমস্ত লোক আছে। হই হই করে ছুটছে।

বেশ সেজেগুজে, সুবাস ছড়াতে ছড়াতে এই হোটেলের একজন রাহী আমাকে মৃদু একটা ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেলেন। মুখে সিগারেট, ধোঁয়া ছাড়ছে।

রাস্তায় নেমে একটু ভেবে নিলুম উত্তরে যাব, না দক্ষিণে?

পাহাড়টা যে দিকে, সেই দিকে যাই। চিরকালই পাহাড় আমাকে টানে। আকাশের গায়ে ধ্যানী মৌনী সাধকের মতো স্থির

অচঞ্চল। কখনও নীল, কখনও ধূসর। কিছুদূর এগোতেই মন্দিরের চূড়ো নজরে পড়ল। তামার পতাকা উড়ছে মাথার ওপর।

বেশ এক চক্কর মেরে হোটেলে ফিরে এলুম। বাইরে এমন কিছু দেখলুম না, যাতে মনে হতে পারে গৌরী খুব বিপদে আছে। আমি এক মূর্খ। এত বড় শহর, সেখানে সামান্য একটা জীবনের জন্যে কার কি মাথা ব্যথা! প্রাচীন শিবমন্দিরের কাছে এক বৃদ্ধ বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনিই আলাপ করলেন যেচে। তাঁর প্রশ্নের ধরনটি ভারি অদ্ভুত। মহাশয় কি পেনসেনার?

আশ্চর্য! পেনশনার হলেই কি গিরিডি আসতে হবে!

তা নয়। ভদ্রলোক কলকাতায় চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর ছেলের কাছে চলে এসেছেন। ছেলে রেলে চাকরি করেন। মানুষটির এমন কিছু বয়েস হয় নি। তবু কেমন যেন অসংলগ্ন। উদ্ভট প্রশ্ন! আমার মতো এক বুড়ো হাবড়াকে কেউ জিজ্ঞেস করে কি, মশায় আপনি বিবাহিত! কথা বলতে বলতে মনে হলো, ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পাগল হতে চলেছেন। বেঁচে থাকলে আর বছর দুয়েকের মধ্যে একেবারে উন্মাদ হয়ে যাবেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আপনার পেচ্ছাপে পিঁপড়ে ধরে?

অবাক হয়ে যেই বললুম, কই না তো!

বিশ্বাস হলো না। উৎকণ্ঠার গলায় বললেন, ভালো করে দেখেছেন? না, দেখেন নি। আপনার চোখের তলা দুটো ফোলা! খুব সাবধান। চিনি একেবারে ছোঁবেন না।

হঠাৎ বললেন. পোস্টাপিসে যাবেন না কি?

বললুম, না পোস্টাপিসে আমার কোনোও কাজ নেই।

তিনি বললেন, বিপদে পড়ে যাবেন। মানি অর্ডার সঙ্গে সঙ্গে না নিলে ফেরত চলে যাবে। ফিরে গেলে আর পাবেন না। টাকাকে অবহেলা করতে নেই। দু'টাকা হোক, দশ টাকা হোক, টাকা টাকাই। আমার সঙ্গে বকবক করলে কোনোও কাজ হবে না, আগে পোস্টাপিসে গিয়ে খোঁজ করে আসুন। আমি তো এখানে সারা দিনই থাকব। আগে কাজ, পরে আড্ডা।

বৃদ্ধের জন্যে মনটা খারাপ হচ্ছে। সারা জীবন, হা অন্ন হা অন্ন, শেষে বিকল মস্তিষ্ক! কিন্তু বিপ্লবের কি হলো! কোথায় গেল? কোনো বিপদ হলো না তো!

প্রায় একটার সময় বিপ্লব ফিরে এলো। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। মনে যাই থাক না কেন, দেহ তার দাবি আদায় করে নেবেই। বিপ্লব চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বললে, মেসোমশাই ব্যাপার খুব গোলমেলে।

সে কি বাবা! গৌরী বেঁচে আছে তো?

বোঝা যাচ্ছে না।

সে কি!

বাড়িটা আমি খুঁজে বের করেছি। উশ্রী ফলসের দিকে যাবার পথে পড়ে। একটা লোক-বিরল, জঙলা জায়গা। এখানে যখন যুদ্ধের আগে চেঞ্জাররা আসতেন, সেই সময় ওই অঞ্চলটার খুব বোলবোলা ছিল। বাঙলো প্যাটার্নের বাড়ি। এক সময় শ্রী ছিল, এখন হতশ্রী।

কি দেখলে তুমি সেখানে?

গেটে ইয়া বড় একটা তালা ঝুলছে। কাকস্য পরিবেদনা।

তুমি গেটে তালা দেখে চলে এলে? এমনও তো হতে পারে, ভেতরে গৌরী আছে, তালাটা একটা লোক ঠকান কৌশল।

আমিও তাই ভেবেছিলুম মেসোমশাই। পাঁচিল টপকে ভেতরেও ঢুকেছিলুম। ঢুকে বড় অবাক হয়ে গেলুম। পেছন দিকের বাগানে, তারে একটা শাড়ি আর প্যান্ট ঝুলছে।

প্যান্ট?

হ্যাঁ মেসোমশাই, প্যান্ট। শাড়িটা হয়ত গৌরীর কিন্তু প্যান্টটা কার? বড় রহস্যময় ব্যাপার। ঝোপের আড়ালে বসে রইলুম অনেকক্ষণ যদি কেউ আসে। না কেউ এলো না, ভেতর থেকে কেউ বেরলোও না। আরও কিছুক্ষণ থাকলে হতো, সাহস হলো না। যদি কেউ চোর ভেবে ধোলাই দেয়।

আচ্ছা বিপ্লব, গৌরীকে কেউ খুন করে তালা বন্ধ করে ফেলে রেখে যায় নি তো!

কি জানি মেসোমশাই, মাথায় আসছে না।

পুলিশের সাহায্য নিলে কেমন হয় ?

কি বলবেন পুলিশকে ?

আমাদের সন্দেহের কথা। বলব, বাড়িটা সার্চ করার কথা।

তেমন সন্দেহজনক কিছু পাওয়া না গেলে, পুলিশ হাসবে। উলটে চার্জ করবে, শুধু শুধু আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করালেন কেন ?

গৌরীর চিঠিটা একটা মস্ত বড় প্রমাণ।

এখনই পুলিশ-টুলিশ না করে, আমি একটু পরে আর একবার ঘুরে আসি বরং। তারপর যা হয় করা যাবে।

এবার আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব। আমার বুকটা কেমন করছে। একি হলো বিপ্লব ?

আপনি উতলা হবেন না মেসোমশাই। এমনও হতে পারে সে ফিরে এসেছে।

কে ফিরে এসেছে ?

আপনার জামাই। আমরা শুধু শুধু ভেবে মরছি। গোলমাল হয়ত মিটে গেছে। যার যা পাওনা সব মিটিয়ে দিয়েছে।

ভগবান তাই যেন করেন।

ভগবান বিশ্বাস আবার ফিরে আসছে নাকি ! শেষ সময়ে তাঁকে ধরলে কিছু কাজ হবে কি ! প্রথম থেকে ধরা উচিত ছিল।

কি করলি গৌরী। নিজের জীবনটাকে এ ভাবে নষ্ট করলি কেন ? মানুষের দেহটা কি এতই বড়। কই আমার মধ্যে তো কোনোও কালেই কাম ছিল না। সংসার পেতেছিলুম সবাই পাতে বলে। সন্তান ! সে তো সব মেয়েই চাইবে। তাহলে ! মজা ! জীবন নিয়ে মজা করতে গিয়ে জীবন এখন জ্বলছে। জীবন যে বড় দাহ্য পদার্থ। কোথায় লাগে কেরোসিন, পেট্রল। বিপ্লব বললে, অত ভাববেন না তো ! এসে যখন পড়া গেছে ব্যবস্থা একটা হবেই। নিন চলুন খাওয়াটা চট করে সেরে ফেলা যাক। বিকেলের আগেই আমাদের বেরতে হবে।

পড়ন্ত বেলার রাস্তা দিয়ে টাঙা চলেছে মন্থর গতিতে। রাস্তাঘাটে তেমন লোকজন নেই। আমাদের সামনের একটা গাড়িতে কালো কোট পরা তিনজন ভদ্রলোক চলেছেন। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় আইন ব্যবসায়ী। এ শহরে কি আদালত আছে ! কে জানে !

তবে মনটা কেমন যেন ছাঁত করে উঠল। বড় অলক্ষণে ইঙ্গিত! হঠাৎ কালো কোট কোথা থেকে এলো! বিপ্লবকে কিছু বললুম না। ভগবানকে বিশ্বাস করে, কুসংস্কারে হয়ত বিশ্বাস নেই।

বিপ্লব বললে, মেসোমশাই আপনার অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট খাচ্ছি।

দেখ, আমরা দু'জনে বন্ধুর মতো। সিগারেট যখন খুশি তুমি খেতে পার, আমার অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই।

বিপ্লব বললে, বাজারের কাছে, উশ্রী যাবার রাস্তার মুখে আমরা গাড়ি ছেড়ে দোব, তারপর হাঁটব। হাঁটতে আপনার ভালোই লাগবে। রাস্তাটা ভারি সুন্দর।

সামনের টাঙাটা দেখেছ বিপ্লব?

দেখেছি মেসোমশাই।

কিসের ইঙ্গিত?

কিসের আবার ইঙ্গিত।

ভগীরথ গঙ্গা আনছেন, ছবিটা ছেলেবেলার বইয়ে দেখেছ। সামনে শাঁখ বাজাতে বাজাতে চলেছেন, পেছনে আসছেন মকরাসীনা মা গঙ্গা। ওই দেখ, আইনের বাহকরা আমাদের নিয়ে চলেছেন, থানা, পুলিশ, কোর্ট, কাছারি।

কি যে বলেন আপনি, মেসোমশাই! আপনার মন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই যত আজেবাজে চিন্তা আসছে। সরকারী রাস্তা, কে কখন যাবে কেউ বলতে পারে! কাছাকাছি শ্মশান থাকলে হরিধ্বনি নিয়ে মৃতদেহ যেত।

আমার মন কি বলছে জান?

কি বলছে?

গৌরী ওই বাড়িরই একটা ঘরে আছে, জীবিত নয় মৃত। গৌরী খুন হয়েছে।

আমার তা মনে হচ্ছে না।

তোমার কি মনে হচ্ছে?

অন্য কিছু।

অন্য কিছুটা কি?

গৌরী আপনাকে ধাপ্পা দিয়েছে।

সে কি! এখনও তুমি মেয়েটার ওপর রেগে আছো?

মানুষের রাগ বেশিদিন থাকে না মেসোমশাই। ঝড়ের মেঘের মতো। আকাশের কোণে জমতে থাকে। খুব তেড়ে ঝড়বৃষ্টি হয়ে মেঘ কেটে যায়। অভিমান অবশ্য অনেকদিন মনে লেগে থাকে। ভালোবাসা আর অভিমান টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। গৌরীর জন্য আমি আপনার মতোই চিন্তিত।

একটা বটতলায় আমরা টাঙা থেকে নেমে পড়লুম। গাছের আড়ালে সূর্য নেমে পড়েছে পশ্চিমে। আকাশ একেবারে জ্বলন্ত কয়লার মতো লাল।

মেসোমশাই, চলুন তা হলে আস্তে হাঁটা যাক। বেশি দূর নয়। এই ধরুন, এক মাইলও হবে না বোধহয়। আমাদের হাঁটা শুরু হলো। বেশ লাগছে। ডানদিকের আকাশে আঁকা পরেশনাথ পাহাড়। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এই সুন্দর পৃথিবীকে মানুষই তছনছ করে দিলে। ঈশ্বরের আয়োজনে কোনোও ত্রুটি ছিল না। আবার ঈশ্বরের কথা আসছে কেন!

গৌরীর বাড়ির যত কাছাকাছি আসছি, বুকটা ততই ছাঁত করে উঠছে। মেয়েটাকে পাব তো! জীবনের শেষ ক্ষণে গৌরী যদি পাশে এসে দাঁড়ায়, আবার একবার নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করব। মৃত্যুর হাত থেকে কিছু সময় ধার করব। যে বাঁচাটা বাঁচা হয় নি, শেষ কটা বছর সেই বাঁচা বেঁচে হাসতে হাসতে চলে যাব। এসেছি কাঁদতে কাঁদতে যাব হাসতে হাসতে।

বিপ্লব বললে, মেসোমশাই কাঁদছেন নাকি?

বয়েস হয়েছে বাবা; অতীতের কথা মনে পড়লেই চোখে যে জল এসে যায়। এই বয়েসটা বড় বিশ্রী। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে থমকে থাকা।

আমরা এসে পড়েছি।

এই বাড়িটা?

হ্যাঁ, ওইটা। এক সময়ে বড় সুন্দর ছিল। বারান্দায় বসলেই চোখের সামনে নীল পাহাড়। হ্যাঁ, শুনুন, প্রথমে আমরা সামনে দিয়ে চলে যাব। যাবার সময় এক নজরে দেখে নোব, গেটে তালা ঝুলছে না সরে গেছে।

যদি তালা দেওয়া থাকে ?

তা হলে, বাড়িটার চারপাশে আমরা ঘুরে দেখব।

তাতে লাভ ?

ভেতরে কেউ থাকলে, বাইরে থেকে বোঝা যাবেই।

যদি মৃত হয় !

আবার আপনার সেই চরম চিন্তা !

ছেলে মেয়ের ব্যাপারে চরম চিন্তাটাই আসে বিপ্লব। তোমারও আসবে তুমি যখন বাবা হবে।

আমি বিপ্লবই থাকব মেসোমশাই, বাবা বিপ্লব আর হতে হচ্ছে না।

যাঃ, তা কি হয়। তুমি একজন সফল ছেলে। তোমাকে সংসারী না করে আমি যাব না।

বিপ্লব মৃদু হাসল। আমার জীবনের প্ল্যান আমি তৈরি করে ফেলেছি মেসোমশাই। জীবনের অন্ধকার দিক আমার দেখা হয়ে গেছে। এবার আমাকে আলোর দিকটা দেখতে হবে। আমি এখন আলোর যাত্রী।

তোমার বাড়ির খবর ?

একেবারে ফাঁকা, গড়ের মাঠ। শ্মশানও বলতে পারেন। বাবা নেই। মা চলে গেছেন বৃন্দাবনে গুরুজীর আশ্রমে। আমরা ভালোবাসার কথা বলি। হাসি পায়। সবই লোক দেখান ন্যাকামি। আমরা সব দেহবাদী। আমার মা আর বাবার ভালো-বাসা, প্রচার আর আদিখ্যেতার অভাবে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল। বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পর মা প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। অভাবের আশঙ্কায় নয় কিন্তু। সাধারণত যা হয়ে থাকে। রোজগেরে মানুষ হঠাৎ সংসার ফেলে চলে গেলে মেয়েরা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। আমার কি হবে গো বলে, যে আকুল কান্না তাতে পঞ্চাশ ভাগ জীবন সঙ্গী চলে যাবার শূন্যতা, আর পঞ্চাশ ভাগ হলো অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। আমার মায়ের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। বাবা যা রেখে গেছেন, দু-পুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে চলে যাবে। কিচ্ছু করার দরকার হবে না। মা আমার সন্ন্যাসিনী হয়ে গেলেন। বৃন্দাবনে কি কষ্টেই না আছেন! অথচ

চেহারায় যেন যৌবন ফিরে এসেছে। ছিলেন আমার মা, এখন হয়েছেন জগতের মা। আমি আর স্ত্রী চাই না মেসোমশাই, আমি মা চাই।

তোমাদের বংশটা যে লোপাট হয়ে যাবে বাবা!

তা কেন? আমার জ্যাঠামশাই, আর কাকাদের দিকে লম্বা হয়ে বেড়ে চলেছে। মিত্তির বংশ দু'শো বছরের জন্যে ভারত ইতিহাসে পাকা হয়ে রইল।

গৌরীর বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে গেল। এত বড় একটা তালা ঝুলছে। বিপ্লবও দেখেছে। আশেপাশে এমন কেউ নেই, যাকে জিজ্ঞেস করা যায়, বাড়িটা ফাঁকা না মানুষ বাস করে!

আমরা বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে, পথের পাশে থমকে দাঁড়ালুম। রাস্তা আমাদের ফেলে সামনে এগিয়ে গেছে ঢালু হয়ে উশ্রী প্রপাতের দিকে।

বিপ্লব বললে, সেই সকালে যা দেখে গেছি, এখনও তাই। জনশূন্য বাড়ি।

কি করা যায় বল তো বিপ্লব?

আশেপাশে এমন কেউ নেই, যাকে জিজ্ঞেস করা যায়! এমন নির্জন জায়গায় একা কি করে থাকত গৌরী!

কে জানে! চলুন বাড়িটার চারপাশ একবার ঘুরে দেখা যাক।

চলো।

বিপ্লব যুবক, আমি বৃদ্ধ। পাথুরে জমির উপর দিয়ে ওর মতো বীর বিক্রমে হাঁটা কি সহজ কথা। পেছন দিকে গোটা কতক সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। হালফিল কেউ ফেলেছে, পাঁচিলের ও পাশ থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে। বেশ দামী সিগারেট বলেই মনে হয়। বিপ্লব বললে, বিলিতি সিগারেট। ব্যাপারটা ক্রমশই রহস্যময় হয়ে উঠছে। এই বাড়িতে সম্প্রতি এমন কেউ থেকে গেছে, যার বিদেশে আনাগোনা আছে, অথবা বিদেশী!

বিপ্লব নিচু হয়ে কয়েকটা কাগজের টুকরো তুলে নিল। টুকরো গুলো হাত দিয়ে সমান করতেই কিছু কিছু অক্ষর পড়া গেল। কলকাতার কোনোও একটা দোকানের ক্যাসমেমোর ছেঁড়া অংশ।

বাড়িটার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ। একেবারে আটকাঠ বন্ধ। বাইরের তারে, শাড়ি আর ফুলপ্যান্ট হাওয়ায় দুলছে। ওই দুটো জিনিস না ঝুললে মনে এত উদ্বেগ আসত না। যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, সে যাবার সময় ওই দুটো জিনিস তুলে গেল না! ছেঁড়াখোঁড়া নয়, একেবারে টাটকা, নতুন।

আর কিছু পাওয়া গেল না। বাড়িটাকে পুরো প্রদক্ষিণ করে আমরা আবার রাস্তায় এসে উঠলুম। এমন পথ না হাঁটে মানুষ, না চলে টাঙা। গেটের দুপাশে বাঁধান রক।

এসো বিপ্লব, একটু বসা যাক।

বিপ্লব বসতে বসতে বললে, মেসোমশাই, যা হয় একটা কিছু করা দরকার।

এখানকার বাঙালী পাড়ায় একবার খবর নিলে হয়।

দেখ বিপ্লব, আমার বয়স্ক মাথায় যে বুদ্ধি আসছে, তাতে মনে হয়, আবোল-তাবোল জায়গায় না ঘুরে, চলো আমরা সোজা পুলিশ স্টেশনেই যাই। আইনের সাহায্য ছাড়া এ বাড়িতে ঢোকার অনেক বিপদ। যদি তেমন কিছু হয়েই থাকে, আমরা বিপদে পড়ে যাব।

আপনি আমাদের বিপদের কথা ভাবছেন মেসোমশাই। গৌরীর বিপদের কাছে আমাদের বিপদ একেবারেই তুচ্ছ। নয় কি?

আমাকে তোমার কথাটাও ভাবতে হচ্ছে বিপ্লব।

আমার অত ভয়ডর নেই মেসোমশাই।

ভয়ের কথা বলছি না, বলতে চাইছি আইনের কথা।

তাহলে চলুন, বাজার মহল্লায় যাওয়া যাক। থানাটা কোন্ দিকে জেনে নেওয়া যাবে। শীত ক্রমশই বাড়ছে। তাই হাঁটতেও খুব একটা খারাপ লাগছে না। বাড়িটা ক্রমশ সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। শীতের রাত নামছে। বাজার অঞ্চলে তাই তেমন ভিড় নেই। সামনেই এক পাঞ্জাবীর দোকান! সামনেই বড় বড় টোম্যাটো সাজান। তন্দুরে পরোটা, তড়কা। তড়কা না তরকা কে জানে। পেঁয়াজ আর রসুনের গন্ধ সন্ধ্যার বাতাসে ভাসছে। সর্দারজী গেলাসে চা ঢালা-পড়া করছেন। পরেশনাথ আকাশের গায়ে ধ্যানস্থ।

মনটা ভালো নেই বলেই, এত খুঁটিনাটি নজরে পড়ছে। গৌরীর কথা ভুলতে চাইছি। ভুলতে পারছি কই। বিপ্লব বললে, আসুন মেসোমশাই, এই দোকানে বসে একটু চা খাওয়া যাক।

দোকানে ভিড় না থাকলেও দু চারজন খদ্দের তো আছেই! রেডিও বাজছে তারস্বরে। আমরা সামনেরই একটা টেবিলে বসলুম। বিপ্লব চায়ের অর্ডার দিলে। আমার কান খাড়াই আছে, যদি কারুর কোনোও কথা থেকে গৌরীর ব্যাপার জানা যায়। নাঃ, সবাই খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত।

বিপ্লব সর্দারজীকে কায়দা করে জিজ্ঞেস করলে, শহরে আজকালের মধ্যে বড় কোনোও ঘটনা ঘটেছে কি না! সর্দারজী এক কথায় বললেন, কুছ নেহী। এরপর বিপ্লব যদি জিজ্ঞেস করে, থানা কোন্ দিকে? তা হলেই কিন্তু সর্দারজী সন্দেহ করবেন। ফিসফিস করে বিপ্লবকে সাবধান করে দিলুম। হাতের একটা আঙুল তুলে বিপ্লব জানালে, বুঝেছে।

চা শেষ করে, একটা সিগারেটের দোকান থেকে বিপ্লব থানার রাস্তা জেনে নিলে। বেশ দূর আছে। একটা টাঙা নিতেই হচ্ছে। যত সময় এগোচ্ছে, ততই আমাদের দু'জনের কথা কমে আসছে। ভালো কিংবা খারাপ যা হয় একটা কিছু হয়ে যাক। এভাবে একটা উদ্বেগ নিয়ে বেশিক্ষণ থাকা যায় না।

থানা মানে বেশ বড় থানা। তা তো হবেই এত বড় একটা শহর। মাইকার টাকা উড়ছে। টাকা হলো অপরাধ আর অপরাধীর জন্মভূমি। থানার অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে বিপ্লবই কথা শুরু করলে। আমি হিন্দী বুঝতে পারি, ভালো বলতে পারি না।

বিপ্লব এক প্যাকেট দামী সিগারেট এগিয়ে দিয়ে কথা শুরু করলে।

উশ্রীর রাস্তায় বাড়ি। বাড়ির নাম হিল ভিউ শুনেই, অফিসার বললেন, ঠারিয়ে ঠারিয়ে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপকা নাম কেয়া, প্রকাশ সান্যাল হ্যায়?

সর্বনাশ! আমার নাম জানলে কি করে! হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, গলা শুকিয়ে কাঠ।

হাঁ জী, হামার নাম ওহি হ্যায়।

আপকো এক তার ভেজা, মিলা ? মিলা নেহি ?

নেহি তো !

বিপ্লব বললে, উয়ো লেড়কী কাঁহা ?

হসপিটাল মে !

কাহে ? হসপিটাল মে ! হুয়া কেয়া ?

শি ট্রায়েড টু কমিট সুইসাইড. লাস্ট নাইট।

আমার মুখে কোনো কথা যোগাল না। হতে পারে। মানুষ যখন দেখে তার পালাবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ, তখন সে আত্মহত্যার কথাই চিন্তা করে ! যে অসুখ কোনো দিন সারবে না, সে অসুখের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় অসুস্থ দেহ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। অত্যাচারীরা ঘিরে রেখেছে, পালাবার আর উপায় নেই, পথ নেই তখন মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে শত্রুপক্ষকে ফাঁকি মার। জাপানীরা হারাকিরি করে।

আমি এ সব কি ভাবছি ! আমার মেয়ে হাসপাতালে !

বিপ্লব বললে, চলুন মেসোমশাই, শিগগীর চলুন, আমাদের হাসপাতালে যেতে হবে।

কি ভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল বিপ্লব ?

ঘুমের ওষুধ খেয়ে !

কোনোও সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে ?

হ্যাঁ।

কোথায় সে নোট ?

পুলিশের কাছেই আছে। সময়ে কোর্টে প্রোডিউস করা হবে। ওতে কিছু লোকের নাম আছে। তারা দৈহিক ও মানসিক ভাবে গৌরীকে টর্চার করছিল। তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই আত্মহত্যা।

তারা কারা ?

রাগে আমার সারা শরীর কিশকিশ করছে। আমার মেয়ে কি ভোগ্য পণ্য ! দোকানে ঢুকলুম, পয়সা ফেললুম, জুতো কিনলুম. পায়ে চড়ালুম. মশ মশ করে হাঁটা শুরু হলো। ছিঁড়ে গেল, ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

নাম আমি আর জিজ্ঞেস করি নি। পরে সবই জানা যাবে। জানতে হবে। তারা যেই হোক, বদলা আমাদের নিতেই হবে। পুলিশ করুক আর না করুক, আদালতে বিচার হোক না হোক, আমাদের বিচারের রাস্তা খোলা রইল। হাসপাতাল নেহাত খারাপ নয়। এক সময় অনেক বড় মানুষে এখানে বেড়াতে আসতেন, তাঁদের বাড়ি এখনও আছে। সেই সময় জায়গাটার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল, তারপর অভ্রের কারবারীরা জাঁকিয়ে বসলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, চোখের দেখা দেখতে পারেন। কমপ্লিট কোমা স্টেজ চলছে। সারভাইভ্যালের চানস জাস্ট ওয়ান পারসেন্ট। ক্রমশই সিংক করছে। আরও বারো ঘণ্টা না গেলে আমরা কিছুই বলতে পারছি না।

এমার্জেনসি ওয়ার্ডে গৌরী শুয়ে আছে।

কত দিন. কত দিন পরে গৌরীকে দেখছি! বাপ হয়ে বলা উচিত নয়, কি রূপ হয়েছিল মেয়েটার। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, মনে হচ্ছে নিখুঁত একটি মূর্তিকে কেউ শুইয়ে রেখে গেছে। সোনার মতো গায়ের রঙ। কেবল মুখটা মোমের মতো সাদা।

এ গৌরী, সে গৌরী নয়। আমি একে চিনি না, আমি যেন বহুদূরের মানুষ। যখন ছোট ছিল, কোলে-পিঠে করেছি, বেড়াতে নিয়ে গেছি, শাসন করেছি, আদর করেছি। সে ছিল আমার মেয়ে, এ তো নারী!

বিপ্লব বললে চলুন, হোটেলে গিয়ে আমরা অপেক্ষা করি, এ ছাড়া অন্য কোনোও রাস্তা নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, ওয়েট অ্যান্ড সি, হোয়াট হ্যাপনস। আমরা খুব চেষ্টা করছি। শি ইজ এ ফাইন ইয়াং লেডি। নট ওনলি দ্যাট শি ইজ ক্যারিং। শি ইজ গোয়িং টু বি এ মাদার।

হাসপাতাল থেকে রাস্তা। রাত বেড়েছে, শীত বেড়েছে। পথ নির্জন। স্বাস্থ্যবান এক যুবক, পেছন দিক থেকে ঝকঝকে একটা মোটর সাইকেল প্রায় ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেল। গায়ে কি রকম একটা চকচকে ছাই ছাই রঙের জামা। আলো পড়ে অপরাধীর চোখের মতো চকচক করছে!

বিপ্লব বললে, মেসোমশাই, সুন্দরী মেয়ে হবার অনেক জ্বালা।

হ্যাঁ বিপ্লব, কুসুম আর কীট।

হোটেলে ফিরে খেতে বসা হলো, তবে খাওয়া গেল না।

এখনও তো আমরা মানুষ। বাঁ পাশে হৃদয় ধক্‌ধক্‌ করছে। মনের আস্তানা কোথায় জানা নেই। মাথায় না পায়ে! বিপ্লবেরও সেই একই অবস্থা। সে তো গৌরীর কেউ নয়। তবু যেন কেমন হয়ে গেছে।

ওদিকে সময় এগিয়ে চলেছে, পায়ে পায়ে, মধ্যরাত্রির দিকে। আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি এই বুঝি ফোন বাজল, ঘণ্টার শব্দে এগিয়ে এলো মৃত্যু। বিপ্লব একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলেছে! সারাঘরে ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। আলোর চেহারা নেশাখোরের চোখের মতো।

বিপ্লব বললে, ওই যে মোটর সাইকেল, হাসপাতালে. আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, খুবই সন্দেহজনক। চেহারাটাই কেমন যেন অপরাধীর মতো। গৌরীর ওপর নজর রেখেছে।

তা হবে!

আপনি যেন একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন?

হাল ধরার অনেক চেষ্টা করে দেখলুম বিপ্লব। মানুষ বড় অসহায়।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।

কি প্রার্থনা করব?

গৌরীর জীবন।

আমি এখন উলটোটাই করব। গৌরীকে ফিরিয়ে নাও ঈশ্বর, এই পৃথিবীতে তাকে আর ফিরিয়ে দিও না। স্বর্গ কোথায় জানা নেই। দীর্ঘ জীবনে জেনেছি, এ পৃথিবী নরক। মানুষের সমাজে মানুষের বাঁচার অধিকার নেই।

কি বলছেন আপনি, মেসোমশাই! গৌরীর মৃত্যু মানে, দুটো প্রাণের মৃত্যু। সে মা হবে।

শত শত প্রাণে, ঝরাপাতার মতো, মানুষের নিষ্করুণ আয়োজন, মুহূর্তে ঝরে পড়ছে, জীবনের কি মূল্য আছে, বিপ্লব এই মানুষ পশুর সমাজে! ওকে যেতে দাও। মৃত্যুতেই ওর মুক্তি। বেঁচে

উঠলেই লোলুপ হায়নারা আবার তেড়ে তেড়ে আসবে। যৌবন হবে কামনার ইন্ধন, ব্যভিচারে বিকৃত হবে ওর রূপ।

মেসোমশাই, আমি আপনাকে একটা ওষুধ দি। আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।

তোমার কাছে চিরনিদ্রার ওষুধ আছে ?

আজ্ঞে না।

তবে থাক। আমাকে সহ্য করতে দাও। কড়ায় গণ্ডায় আমার সব পাওনা বুঝে নিতে দাও। রাত বুঝি শেষ হয়ে এলো! পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি। দুঃখের রাত তো সহজে শেষ হয় না!

বিপ্লব, পাখি ডাকছে, ভোর হলো ?

না, মেসোমশাই, শীতের রাত বড় দীর্ঘ হয়।

তাহলে!

ভুল করে ডেকেছে।

ও, পাখির ভুল হয়!

নিচের হলঘরে ঘড়ি বাজছে। রাত তিনটে।

বিপ্লব, একবার ফোন করলে হয় না ?

এত রাতে কেউ ধরবে মেসোমশাই ?

ধরবে না! আমার মেয়ে অসুস্থ।

দেখি একবার নিচে যাই। একটু চা খাওয়া দরকার।

ওপাশের জানলাটা একবার খুলি। দেখি, আকাশে ভোরের রঙ ধরেছে কি না! কোথায় ভোর! রাত ঝিমঝিম করছে। পরেশনাথের বিশাল আকৃতি আরও যেন এগিয়ে এসেছে চোখের সামনে। রাতে পর্বত যেন আরও ভীষণ হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র মানুষকে ভয় দেখাতে থাকে। বহু দূরে গাছের ফাঁকে, একটি মাত্র আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে। বিশাল অন্ধকারে একটি মাত্র আলোর ফোঁটা।

নিচের অফিস ঘরে ফোন বাজছে থেমে থেমে।

বাজছে! তার মানে, ওরাই ফোন করছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার। আমি যেন এক ফাঁসীর আসামী। একা রাত জাগছি আমার নির্জন কারাকক্ষে। সান্ত্রীর পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

না, যাই, নিচে নেমে যাই।

সিঁড়ি ভেঙে ধীরে ধীরে নামছি। এখানে ওখানে মৃদু আলো জ্বলছে। চাপা সাদা আলো। অন্ধকার বসে আছে হামাগুড়ি দিয়ে ভীত প্রাণীর মতো। দিন আসছে চাবুক হাতে।

মেসোমশাই!

বিপ্লবের গলা। একি আনন্দ, না আর্তনাদ!

ফোন নামিয়ে রেখে বিপ্লব ছুটে আসছে! ভবিষ্যৎ যেন ছুটে আসছে দু-হাত মেলে।

আমাকে জড়িয়ে ধরে আবেগরুদ্ধ গলায় বিপ্লব বলতে লাগল, আছে আছে, মেসোমশাই গৌরী আছে। গৌরী আছে।

আমার আলিঙ্গনে বিপ্লব ফুলে ফুলে কাঁদছে। এতদিন ধরে এত আবেগ, সে চেপে রেখেছিল? পর্বতশীর্ষে তুষার জমে। জমে জমে কিরীট তৈরি হয়। হঠাৎ একদিন সব কিছু চুরমার করতে করতে নেমে আসে সানুতে। গৌরীকে এতকাল তুমি ধরে রেখেছিলে তোমার মনে? আমি জানতে পারি নি, তুমি কি জানতে?

আমি বৃদ্ধ মানুষ, আমার দেহের সঙ্গে, আমার মনের সঙ্গে আবেগ, অনুভূতি সবই মরে আসছে। জীবনে প্রচুর ধাক্কা খেয়েছি, খেতে খেতে পোড়-খাওয়া হয়ে গেছি। তবু আমি বলতে চাই।

ঈশ্বর, জীবনের শেষ কটা দিন, এদের নিয়ে আমাকে বাঁচতে দাও।

এ আমি কি ভাবছি? গৌরীর জীবনে বিপ্লব তো একটা ছায়ার মতো! তবু, তবু, অসম্ভব যদি সম্ভব হয়। কত কিই তো হয়! খারাপ যদি হতে পারে, ভালো কেন হবে না!

এক সঙ্গে অনেক পাখি ডাকছে।

এবার আর ভুল করে নয়, বিপ্লব, এবার সত্যিই ভোর হয়েছে।

বিচার
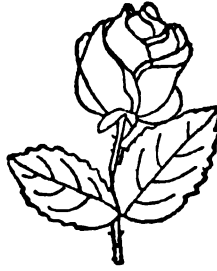
আজ কাগজে অলকার ছবি বেরিয়েছে।

পরশু রবীন্দ্রসদনে সাংঘাতিক গান গেয়েছে। সমালোচক লিখছেন, তিনি এর আগেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিল্পীর গান শুনেছেন কিন্তু এই অনুষ্ঠানে তাঁর পরিবেশন তুলনাহীন। আগের সমস্ত অনুষ্ঠানকে ম্লান করে দিয়েছেন। স্বর বিন্যাসে, কণ্ঠ সম্পদে···

পরের দুটি পরিচ্ছেদে সমালোচক বাধাহীন উচ্ছ্বাসে ভেসে গেছেন। দু-একবার অলকার রূপের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বেশ বোঝাই যায় সমালোচক প্রেমে পড়ে গেছেন। অলকা আর অলকার কণ্ঠে গজল, একটু বেশি রাত, মঞ্চের মায়াবী আলো, অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ, একজন মানুষকে পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সমালোচকের আর দোষ কি! তিনি তো রক্ত-মাংসের মানুষ! দেবতা হলেও সংযম হারিয়ে ফেলতেন।

অনুষ্ঠানসূচীতে কি লেখা ছিল জানি না। সমালোচক অলকা মুখোপাধ্যায়ই লিখেছেন। নামের পেছনে এখনও আমার পদবীই লেগে আছে দেখছি। মনে মনে ছাড়লেও আইনত ছাড়তে পারে নি। জানি না, হয় তো আর মাস তিনেক পরেই মিত্র হয়ে যাবে, কিম্বা বোসও হতে পারে।

আজকাল ছাপার অনেক উন্নতি হয়েছে। অলকার ছবিটা বড় স্পষ্ট এসেছে। মসৃণ আলোয় ভাসছে অলকার চোখ, মুখ, নাক, এক রাশ মাথার চুল। চিবুকের তিলটিও স্পষ্ট হয়ে আছে। অনেক দিন এত ভালো করে অলকার মুখ দেখি নি। জীবন্ত যে

মুখের দিকে তাকান যায় না, ছবির সেই মুখের দিকে আমি যতক্ষণ খুশি নির্ভয়ে তাকিয়ে থাকতে পারি। ভুরুর ওপর বিরক্তির ভাঁজ দেখা দেবে না, মুখে ঘৃণার ছায়া নামবে না। সামনে থেকে সরে যাবে না দ্রুত পায়ে। আমার আজকের এই সকাল অলকাকে সামনে রেখে দুপুরের দিকে গড়িয়ে যেতে পারে। হঠাৎ কোনোও জরুরি ডাক না এলে দুপুর গিয়ে বিকেল এসে যেতে পারে। কিন্তু কেন আমি বোকার মতো, মোহগ্রস্ত মানুষের মতো এই মহিলার ছবির দিকে সারাদিন তাকিয়ে বসে থাকব। রূপ আছে বলে, কোনোও একটা বিশেষ গুণ আছে বলে! এ তো তার আলোর দিক! অন্ধকার দিকটা কি সমালোচক মহাশয় জানেন! চাঁদের আলোর দিকটা দেখে আমরা বলে উঠি আহা! চাঁদ! অন্ধকার দিকটা দেখা যায় না তাই। দেখা গেলে মানুষ শিউরে উঠত। জলহীন অন্ধকার নদী, অন্ধকার সমুদ্র, পর্বত কন্দর, বিষাক্ত গিরগিটির মতো এবড়ো-খেবড়ো ভূ-খণ্ড চিররাত্রির কোলে পড়ে আছে।

বিষ্ণু চা নিয়ে এসেছে। আমার এই একক জীবনে বিষ্ণুই এক-মাত্র ভরসা। সকালে চা আর খানকয়েক বিস্কুট খেয়ে জিপ নিয়ে বেরিয়ে যাই। বিলিতি কায়দা আমার সহ্য হয় না। ডিম, টোস্ট, ফল, সাত সকালেই গোগ্রাসে গিলতে ভালো লাগে না। কেমন যেন পশু পশু লাগে। সকাল বড় পবিত্র সময়। ওই সময়টায় উপবাসে থাকলে শরীর শুদ্ধ হয়। মন প্রসন্ন থাকে। আমি এক-জন ইরিগেসান ইন্‌জিনিয়ার। জল নিয়েই আমার কারবার। কংসাবতীর বাঁধ থেকে সেচের জল ছাড়া আর বর্ষায় কাঁসাইয়ের বাঁধে জল ধরাই আমার কাজ। অপার জলরাশির দিকে তাকিয়ে সারাটা সকাল আমার কেটে যায়। জলে সকালের সূর্যের আলোর প্রতিফলন দেখি। নীল আকাশকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখি। বর্ষার কালো মেঘ দেখে বুঝি, আমার এই বাঁধে ওপরের পাহাড় থেকে এইবার জলের ঢাল নেমে আসবে। সঙ্গে আসবে গেঁড়ি মাটি, অভ্রকণা, খনিজ চূর্ণ। শরতের সাদা মেঘ দেখলেই বুঝি প্রকৃতি শান্ত হয়ে আসছে। কাশফুলের ফাঁকে চাঁদ হাসবে। বছরের ফসল উঠবে কৃষকের ঘরে।

বাঁধের জলে মধ্যাহ্নের ছায়া নামে। বুঝতে পারি প্রকৃতির

চোখে ঘুম নামছে। চারপাশ থেকে নেমে এসেছে কংক্রিটের গড়ানে গাঁথনি। চঞ্চল বালিকা বাঁধা পড়ে গেছে মানুষের হাতে। আয়নার মতো স্থির হয়ে পড়ে আছে উদ্দাম জলরাশি। মাঝে মাঝে বাতাসের শিহরণ খেলে যায়। মাছরাঙা ছোঁ মেরে নেমে আসে। টিয়া আর ময়না গান শোনাতে আসে সেই নিস্তব্ধ জলসায়। সে গানে আকাশ থেকে জলে নামে, দেয়ালে আহত হতে হতে, ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে আবার আকাশের দিকে উঠে যায়। টিলার গা বেয়ে অকারণে, মাঝে মাঝে পাথর গড়িয়ে পড়ে। জল যেন তাদের ডেকে নেয়।

হাসি পায়। যে জল বেঁধেছে, সে এক নারীকে বাঁধতে পারল না।

বিষ্ণু চা, আর ডাক রেখে গেল। এ সব চিঠি আমার চেনা। সরকারী বায়না। অমুক পাঠাও নি কেন, তমুক হলো না কেন? ক্যাটমেন্টে বৃষ্টিপাতের গড় হিসেব কোথায় গেল! কাঁসাইয়ের জলের বাড়া কমার পরিসংখ্যান সাতদিনের মধ্যে জানাও। মন্ত্রী উদ্বিগ্ন। খাম না খুলেই আমি চিঠি পড়তে পারি। এর কোনোও-টারই উত্তর আমাকে দিতে হবে না। সই মেরে ছেড়ে দেবো। যা করার অধস্তনরাই করবে।

আজ দিনটা ভারি উজ্জ্বল। দলছুট একটা দিন। আকাশ একেবারে নিষ্পাপ নীল। পরশু প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটি শুকোচ্ছে, তাই কেমন একটা গন্ধ বেরচ্ছে। বাতাস কখনও শীতল, কখনও উষ্ণতা মাখা।

যে চা এই মাত্র বিষ্ণু আমাকে দিয়ে গেল, সে চা অলকা আমাকে দিতে পারত। আমার সামনে ওই ডেকচেয়ারটায় বসতে পারত। আমার স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারত। জীবন কি শুধুই খ্যাতির তালাসে শেষ হয়, জীবন কি শুধুই সাফল্যের মেজারিং গ্লাস। জীবন কি শুধুই হিসেবের খাতা। বেহিসেবি কিছুই কি থাকতে নেই!

কে বুঝবে, কে বোঝাবে! যে বোঝার সে বুঝেই আসে, হাসতে হাসতে চলে যায় জীবনকে জয় করে। যে জ্বলার সে জ্বলতে আসে, পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জীবনের কাছে কিছু না চাইলেই জীবন জব্দ। কিছু চাইতে গেলেই জীবন তাকে ক্রীতদাস করে রেখে দেয়।

এতই যদি বুঝে থাকি তাহলে আমার এমন দুঃখ কেন? আমি অনেক কিছু চেয়েছি। তাই আমার পরাজয়। আমার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আমি হৃদয় চেয়েছি। পাই নি। আমি বন্ধু চেয়ে শত্রু পেয়েছি। আমি ঘর চেয়ে ঘর ছাড়া। আমি আমার সব কিছু দিতে চেয়েছি, নেবার মতো কেউ ছিল না। যে নেয় সে কেড়ে নেয়, দিতে চাইলে দান হয়, দাতা গ্রহিতার চেয়ে বড়। আমার ডালা নিয়ে তাই আমি বারে বারে ফিরে এসেছি। আমার অহংকার ধাক্কা খেয়েছে।

আমি বুঝি সব, কেবল সামলাতে পারি না নিজেকে। একই ভুল বারে বারে করি। কিছু কিছু ছাত্র আছে যারা কিছুতেই শিখতে চায় না। জগৎ পাঠশালায় আমি সেই রকম এক ছাত্র।

আকাশ থেকে চোখ ফিরে এলো টেবিলে। ড্যামসাইটে যাবার আগে চিঠিতে সই মেরে যেতে হবে। আমার চাকরির এই এক সুবিধে, আস্তানা আর অফিস এক হয়ে গেছে। যখন খুশি কাজ কর, আবার ইচ্ছে না হলে চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় পার করে দাও। আকাশ দেখাও আমার একটা কাজ। মেঘ চিনতে হবে, বৃষ্টি আসছে কিনা! এলে তার পরিমাণ কি দাঁড়াবে! ড্যামের কটা স্লুইস গেট বন্ধ রাখব, কটা খুলে দোব। নিচের দিকে ফসলের জমিতে যারা জলের আসায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাছে আমি এক অদৃশ্য বরুণ দেবতা।

আমি মেঘ চিনি, নারীর মন চিনি না।

সরকারী চিঠির গাদায় বেসরকারী একটি চিঠি। ঠিকানায় হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে চেনা চেনা। খামটা আলোর দিকে তুলে ধরতেই ভেতরের ভাঁজ করা কাগজ নজরে পড়ল। কার চিঠি? অলকার! না না! শেষ চিঠি লিখেছিল তিন বছর আগে। তিক্ততা আর বিদ্বেষে ভরা। ভাষার আঁচল সরালে সে চিঠির ভাব ছিল, তুমি একটি অবুঝ জানোয়ার। তোমার দেহ আছে মন নেই। তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল। চিনে যখন ফেলেছি তখন সাবধান হওয়াই ভালো। তোমার আর আমার পথ আলাদা। দেখা হবে আদালতে।

চিঠির জুতো পায়ের জুতোর চেয়ে শক্তিশালী।

খুলতেই বোঝা গেল কাজলের চিঠি। 'হঠাৎ দিন তিনেক ছুটি পাওয়া গেল। কলকাতায় ছুটি কাটান যায় না। তোমার কাছে যাচ্ছি। খুব মজা হবে। গোমড়া মুখে চিঠি পড় ক্ষতি নেই ; কিন্তু হাসি মুখে তোমার চার চাকা নিয়ে যথা সময়ে স্টেশানে হাজিরা দিও। মেয়েদের মন বুঝতে শেখ, প্রভু বিশ্বকর্মা!'

কাজল আসছে। কাল সকালে। জিপ নিয়ে স্টেশানে হাজির হতে হবে। এই সময় কাজল এলে মন্দ হয় না। স্বপ্ন দেখাতে আসছে। এক রকমের মেঘ যা কেবল আকাশের শোভা। বাতাসের খেয়ালে আসে ভেসে চলে যায়। এক ধরনের মেঘ আছে, শ্যামল বর্ণ, জলভারে ভারাক্রান্ত। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবীকে সবুজ করে নিঃশেষ হয়ে যায়। কাজল সেই জলভরা মেঘ।
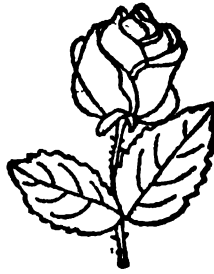
অনেক আগেই স্টেশানে পেঁাছে গেছি।

স্টেশান মাস্টারের ঘরের আলো ফ্যাকাশে হয়ে এলেও, রাতের স্মৃতি তখনও পড়ে আছে। শেষ রাতের মায়াবী আলোয় স্টেশান জেগে উঠেছে। ট্রেন আসছে। সামান্য লেট আছে। এক ভাঁড় চা খেলুম। গেটের সামনে চেকার এসে গেছেন। পোর্টাররা প্রস্তুত। বাইরে সারি সারি রিকশা লেগে গেছে।

আমার জায়গা থেকে স্টেশান বেশ দূর। যখন বেরিয়েছি, তখন রাত ছিল। সবে একটি মাত্র পাখি, ঘুম জড়ান ঠোঁটে ডাকার চেষ্টা করছিল। পথের দুপাশে নিস্তব্ধ অরণ্য। গাছের তলায় তলায় অন্ধকারের গাঢ় তলানি। দিনের তাড়া খেয়ে চুঁইয়ে নেমে

এসেছে। একটু পরেই মার খেয়ে পালাতে হবে।

রাতের ভাগ্য দিনের হাতে।

যখন হেড লাইটের আলো পড়ছিল, অন্ধকার যেন চোখে হাত চাপা দিচ্ছিল। শুকনো পাতায় উঠছিল সরীসৃপের শব্দ। রাতের বিছানা থেকে ভয়ে পালাচ্ছিল আলোর তাড়া খেয়ে। জিপের সামনে এক জোড়া সাপ পড়েছিল। আমাকে অনেকক্ষণ থেমে থাকতে হয়েছিল। সাপের এটা ঋতুকাল। বড় সুন্দর দৃশ্য। ন্যাজের ওপর ভর রেখে মাটির ওপর তুলে ধরেছে চিত্রবিচিত্র দীর্ঘ শরীর। গলায় গলায় জড়াজড়ি। মাঝে মাঝে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আবার তারা ঠেলে উঠছে মিলিত অবস্থায় আকাশের দিকে। বনভূমি ছেয়ে গেছে সুবাসে। কোথাও কেউ যেন কামিনীভোগ চালে পরমান্ন বসিয়েছে। গন্ধ আমি চিনি। সাপও আমি চিনি। ওরা ছিল শঙ্খচূড়।

এঁকে বেঁকে বিশাল একটা কেন্নোর মতো ট্রেন আসছে। আসছে কাজল। কাজল কি ভাবে জড়িয়ে পড়ল জীবনের সঙ্গে। হঠাৎ আলাপ। আলাপ হয়েছিল পুরীতে। ইন্‌জিনিয়ারদের একটা কন্‌ফারেনস ছিল ভুবনেশ্বরে। সেটা শেষ করে একা একাই চলে গেলুম পুরীতে। মন মেজাজ তখন ভীষণ খারাপ। অলকার সঙ্গে সম্পর্ক তখন এত তিক্ত, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছিলাম না। সম্পর্কিত শত্রুর মতো পাশাপাশি থাকা। বাক্যালাপ বন্ধ। দুজনেই সুযোগ খুঁজছি। একটা ছুতো পেলেই আগুন জ্বলে যাবে।

উঠেছি পুরী হোটেলে। সারাদিন সমুদ্রের ধারে ধারেই কেটে যায়। তখন সিজন চলেছে। চারপাশে গিজগিজ করে বেড়াচ্ছে ভ্রমণার্থীরা। উল্লসিত ছেলে আর মেয়ের দল। একদিন চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ চক্রাতার দিক থেকে বেলাভূমির ওপর দিয়ে সমুদ্র আর ঢেউ দেখতে দেখতে ফিরছি। গলায় ঝুলছে ক্যামেরা। ক্যামেরা আমার একটা হবি। গভর্ণর হাউসের কাছাকাছি এসেছি, হঠাৎ নারীকণ্ঠ ভেসে এলো, এই যে শুনছেন!

চমকে ফিরে তাকালুম। নিরিবিলি জায়গায় তিনটি মেয়ে পাশাপাশি বসে।

আমাকে বলছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি।

একথা যে বলল, তার নামই কাজল। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। এ ভাবে একজন অপরিচিত লোককে এ দেশের মেয়েদের ডাকার সাহস হয়েছে ভেবে অবাক হচ্ছি। দেশ তাহলে কতদূর এগিয়ে গেছে! মেয়ে তিনটির চোখ দেখতে পাচ্ছি না। চোখে আধুনিক কায়দায় সানগ্লাস। আর দুটি মেয়ে বলছে, যাঃ, কি হচ্ছে কি! বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। তিনটি মেয়ে, একটি পুরুষ। টিজ্ করতে চাইছে না কি ? আগে ছেলেরা মেয়েদের করত, এখন হয় তো মেয়েরা ছেলেদের করছে। চাকা ঘুরে গেছে। ভয় পেলে চলবে না। বললুম, কি বলুন ?

আমাদের তিনজনের একটা ছবি তুলে দেবেন!

বেশ সহজ সরল অনুরোধ। কোনোও খোঁচা বা ব্যঙ্গ নেই। মেয়ে তিনটিকে বেশ ভদ্র বলেই মনে হলো। সমবয়সী। তিনজনেই মনে হয় ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ছবি তোলার কথা বললে তখন আর আমি বাস্তুকার সমীর বোস নই, ফটোগ্রাফার সমীর বোস। কোনোও প্রকৃত শিক্ষকের অচেনা উৎসাহী ছাত্র যদি বলে আমাকে একটা অঙ্ক দেখিয়ে দেবেন তা হলে তিনি যেমন শেখাবার উৎসাহে সব ভুলে এগিয়ে যান, আমারও সেই অবস্থা হলো।

ট্রেন ইন করল। ইঞ্জিন এগিয়ে চলেছে প্লাটফর্মের প্রান্ত ছুঁতে। গতি শ্লথ হয়ে গেছে। সেদিনের কথা পরে বলছি। আগে কাজলকে নামিয়ে আনি। মিথ্যে বলব না, মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। আমি দেহ চাই না, একঝুড়ি গুণ চাই না, একঝুড়ি মন চাই।

অলকা একথা বোঝে নি। শিল্পীরা সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু অন্য রকমের হয়। তা তো আমি জানতুম না। অপারেশনে ভুল হলে যে রকম রুগী বাঁচে না, জীবন-সঙ্গিনী নির্বাচনে ভুল হলে তেমনি সংসার থাকে না।

কাজল কোন্ কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে এলো কে জানে। দূর থেকে এগিয়ে আসছে। চলন যেন রাজেন্দ্রানীর মতো। বেশ লম্বা, স্মার্ট চেহারা। ধারাল মুখ, চোখ নাক। ববকরা চুল

বাতাসে উড়ছে। নীল শাড়িতে মানিয়েছে ভালো। কাজলের হাসিটি ভারি সুন্দর! মুক্তোর মতো ছোট ছোট দাঁত বেরিয়ে আসে। গালে একটা টোল পড়ে।

হাসি দেখে মানুষ চেনা যায়। একথা আমাকে বলেছিলেন মস্ত বড় একজন গৃহীসাধক। নাম বললে সবাই চিনবেন। কাজল হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। হাতে একটা ভি. আই পি. সুটকেস। আমি ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলুম। অন্য সময় আমি এক ধরনের অহমিকায় ভুগি। সেই অহমিকার উৎস আমার পদ-মর্যাদা। কিন্তু ভালবাসার মানুষের বোঝা বওয়ার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ আছে। আমি বলে বোঝাতে পারব না।

ভালবাসা মানুষকে ছোট হতে শিখিয়ে বড় করে। যে কথা আমি অলকাকে বোঝাতে পারি নি।

কাজল কাছাকাছি এসে বললে, সুপ্রভাত। আমি সারারাত জেগে জেগে এলুম, আর তুমি ঘুমিরে ঘুমিয়ে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছ। বেশ আছ।

ব্যাগটা হাত থেকে নেতে নিতে বললুম, আজ্ঞে না. আমার ঘুম খুব কম। এখানকার জলবাতাসে যত দিন যাচ্ছে ততই ফুলে উঠছি। তুমি দিনকতক থেকে দেখ না। তোমারও কেঁদো বাঘের মতো চেহারা হয়ে যাবে।

তুমি আমাকে আনার ব্যবস্থা করো না. তা তো করবে না, ভীতু কোথাকার!

জীপের পেছনের আসনে কাজলের ব্যাগ রেখে. আমরা দু'জনে সামনে উঠে বসলুম। কাজল বললে, সেই দোকানে একবার থামাবে তো! সেই চা আর গরম গরম জিলিপি!

নিশ্চয়ই থামাব। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম।

আহা খুব কথা শিখেছ। আমার সেই চাপরাস কোথায়, যে কর্ত্রী হব!

সে কি আমার দোষ! ওদিকে ফাইন্যালি একটা কিছু না হলে মুক্ত পুরুষ হতে পারছি কই? ঠোকরান ফল হয়ে ঝুলে আছি! ন দেবায়, ন হবিষায়!

তোমার বউ কিন্তু সাংঘাতিক ভালো গাইছে আজকাল। এই

সেদিন আমি রবীন্দ্রসদনে শুনে এলুম। যাই বলো, একেবারে জাতশিল্পী। অদ্ভুত সুন্দর বিরহী বিরহী চেহারা হয়েছে। মনে হয় তোমার বিরহে।

কাজল প্লিজ, তুমি ওই প্রসঙ্গ তুলো না।

কেন? দুঃখ হচ্ছে?

না রাগ। অসম্ভব রাগ হচ্ছে। আমার হাতে স্টিয়ারিং। আশী কিলোমিটার ছুটিয়ে একটা কেলেঙ্কারি বাঁধাব. সেটা ভালো হবে?

অলকার কথা বললে তুমি ওরকম করো কেন সমীর! জেলাসি!

প্রসঙ্গটা তুমি পালটাবে কাজল! এমন সুন্দর সকালটা কেন তুমি নষ্ট করে দিচ্ছ?

কাজল চুপ করল। শালবনের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেছে। এমন সবুজ আলোর সকাল অরণ্য ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। চুপ করে আছি দেখে কাজল বললে, রাগ করলে?

না, আমি কারুর ওপর রাগ করতে পারি না, আমার সব রাগ নিজের ওপর। অলকার অহংকার কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। নিজেকে ছাড়া সকলকেই কুকুর বেড়াল মনে করে।

বিয়েটা তাহলে হলো কি করে! সরি আবার আমি ওই প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গটা আসবেই কাজল! যখনই তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তখনই ও প্রসঙ্গ আসতে বাধ্য। কারণ তোমার আর আমার মাঝখানে অলকা দাঁড়িয়ে আছে।

তুমি যে আমার কি সর্বনাশ করে দিলে সমীর! সেই পুরীতে তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর আমার কি যে হলো! কোথায় কি যে একটা খুলে গেল, নিজেকে কিছুতেই আর তোমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে পারছি না। নিজেকে কতো বোঝাই, কত চেষ্টা করি বেঁধে রাখার। পারি না। কিছুতেই পারি না। সমীর একেই কি ভালবাসা বলে?

বড় কঠিন প্রশ্ন কাজল। অলকাও একদিন ভালবাসার কথা বলত। ভালবাসার উল্টো পিঠ ঘৃণা, ঘৃণার উল্টো পিঠ ভালবাসা। ও কথা শুনলে এখন আমার ভয় করে, আতঙ্ক হয়। না পাওয়ার

সঙ্গে মানুষ মানিয়ে নিতে পারে। পেয়ে হারালে মন ভেঙে পড়ে। পরাজয়ের বড় বেদনা কাজল! তুমি দূরে থেকে আজ যা বলছো, কাল কাছে এলে তুমি অন্য কথা বলবে। নেশার কথা আর নেশা ছুটে যাবার পরের কথায় আকাশ পাতাল তফাৎ।

আমি কি তোমার থেকে অনেক দূরে আছি সমীর! তুমি তো বল, অলকা যা ছ বছরে পারে নি, আমি তা এক বছরেই পেরেছি। তবে?

কাজল, আমার বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি বলছি. আমি কিছু জানি না। তোমাদের জগৎ বড় জটিল জগৎ। আমি আছি, তুমি আছ। আমি তোমার হতে রাজি আছি, তুমি আমার হবে কিনা, সে তুমিই জান। হলেও কতটা হবে, কতদিনের জন্যে হবে তুমিই জান। কাজল ছেলেরা সহজে ছাড়তে চায় না, ভাঙতে চায় না, মেয়েরা বড় ভাবপ্রবণ! শরতের আকাশের মতো। এই মেঘ এই রোদ। বোঝা বড় শক্ত, কখন কি করে বসে!

শালবন শেষ হয়ে গেল। ছোট্ট একটা সাঁকো পেরতেই লোকালয় শুরু হয়ে গেল। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার। হরিময়রার সেই বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। এক পাশে জিপ রেখে আমরা দু'জনে দোকানে এসে ঢুকলুম। হরিবাবু বৃদ্ধ হয়েছেন। ছেলেরাই দেখাশোনা করে। কারিগররা সব পুরনো তাই স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে। এদিকে এলেই এই দোকানে ঠেক খেয়ে যাই, তাছাড়া জিপ মানেই সরকারী ব্যাপার, সেই কারণেই খাতিরও একটু বেশি।

কি খাবেন স্যার, বলে দু'জনে এক সঙ্গে এগিয়ে এলো।
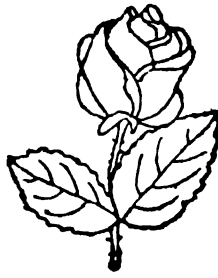
কাজল কিছুতেই কংসাবতীতে থাকতে রাজি হলো না।

তুমি এখানে থাকা মানেই, তোমার পেছন পেছন অফিস ঘুরে বেড়াবে। এটা ওটা সেটা। তাছাড়া সবাই জানে, তোমার বউ আছে। আমি তেমন ফ্রি হতে পারব না। তোমার কোনোও বদনাম হোক, এ আমি চাই না। তুমি তিন দিনের জন্যে কোথাও একটা চলো।

কাজল বেশ সাবধানী মেয়ে। আমার যাবার জায়গার অভাব নেই। ইরিগেশানের বহু ডাকবাংলো চারপাশে ছড়ান। ফরেস্ট বাংলোরও অভাব নেই। বেলা তিনটে নাগাদ আমরা ঝিলিমিলি এসে পৌঁছেছি। আমাদের দু'জনেরই প্রিয় জায়গা। যাক তিন দিন অন্তত নতুন জীবনের স্বাদ পাওয়া যাবে। এই ভাবেই জীবন থেকে আনন্দ ছিনিয়ে নিতে হবে।

তবে দুঃখ কাকে বলে আর আনন্দ কাকে বলে তাই তো জানি না।

অদ্ভুত সুন্দর চাঁদিনী রাত। চারপাশ ঝলমল করছে। বাংলোর বাইরে দুটো চেয়ার পেতে কাজল আর আমি দু'জনে মুখোমুখি বসে আছি। চাঁদ এখনও বেশি দূর উঠতে পারে নি, তার মানে রাত এখন অনেক বাকি। সুখের মুহূর্ত চট করে শেষ হয়ে যাবে না।

দু'জনের মাঝখানে একটা সেন্টার টেবিল। বাংলোর চৌকিদারের নাম ভূষণ। পুরনো লোক। সায়েবদের কি ভাবে সেবা করতে হয়

জানে। রান্নার হাত খুবই ভালো। আমাদের চা দিয়ে, বাজারে ছুটেছে। আমার কাছে এলেই কাজলের পাগলামি শুরু হয়। এমন সব কথা বলে! বলে তোমার কাছে আবদার করব না তো কার কাছে করব? ভূষণকে জপিয়ে জপিয়ে ঠিক করেছে, রাতে লুচি আর মুরগীর মাংস হবে।

কাজলের কেউ কোথাও নেই। মামারবাড়িতে মানুষ। থাকে কলকাতার এক লেডিজ হস্টেলে। টেলিকমিউনিকেসানে কাজ করে। এখন পোস্টিং দমদম এয়ারপোর্টে। পদার্থবিদ্যার ভালো ছাত্রী ছিল। হাই মার্কস নিয়ে অনার্স পেয়েছে। এমন একটা অসহায় ভালো মেয়ের ভার কাঁধে তুলে নিতে পারলে বর্তে যেতুম। সংসারে সোনা ফলিয়ে ছেড়ে দিতুম। জীবনে আমার অনেক আশা ছিল। ছোট ছোট সব স্বপ্ন ছিল। ক্রমশই নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছি।

মানুষ মানুষকে কত কষ্ট দিতে পারে, আবার কত আনন্দও দিতে পারে। মানুষের কোনোও তুলনা নেই। জীবজগতের কোনোও নিয়মই মেনে চলে না।

কাজল আর বসে নেই, প্রায় শুয়ে পড়েছে। গুন গুন করে গান হচ্ছে।

উদাস গলায় বললে,

আমি প্রায়ই ভাবি।

কি ভাবো?

তোমার সঙ্গে আমার কি অদ্ভুত ভাবে আলাপ হলো!

সোজা উঠে বসল, দ্যাখো, ঈশ্বর আছেন, তা না হলে এমন কেন হবে! সেদিন আমরা তিনজন ছিলুম। তিনজনের সঙ্গেই তোমার আলাপ হলো। কাছে চলে এলুম আমি।

কেন এলে?

আমার মনে হয়, তুমি আমার ম্যাগনেট। সকলে সকলকে টানতে পারে না। অলকাকে তুমি পারনি। আমাকে পেরেছ। জানলে, মনে মনে একটা কিছু ব্যাপার হয়।

তা তো হয়ই। সবচেয়ে বড় দেওয়া নেওয়া মনে মনেই হয়।

কি আশ্চর্য লাগে এখন! মানুষ দলে পড়ে কত কি যে করতে

পারে। তোমার বুকে ক্যামেরা ঝুলছে, দূর থেকে আসছে, লম্বা লম্বা পা ফেলে। সমুদ্রের বাতাসে তোমার লম্বা লম্বা চুল উড়ছে। ওরা বললে, কাজল বলতে পারবি, আমাদের তিনজনের একটা ছবি তুলে দেবেন।

হ্যাঁ পারব। বাজি।

বাজি।

বিশ টাকা।

বাঃ আমি তুললুম ছবি, তুমি জিতলে বাজি? একথা তো আগে বলো নি! আজ তা হলে আমাকে পনের টাকা দাও। বড় শেয়ার তো আমারই। আমি তোমার কথা না শুনলে তুমি হেরে যেতে।

কাজল হাসল, পনের টাকা! আমি নিজেকেই দিয়ে দিলুম, তুমি এখন পনের টাকার শোকে উতলে উঠছ! জানো বিয়ের পর আমরা ইওরোপ বেড়াতে যাব। তোমার আমার রোজগার এক করলে অনেক টাকা হয়ে যাবে। আমরা তখন বড়লোক, কি বল? আমার টাকায় সংসার চলবে. তোমারটা পুরো জমবে। জমে জমে যখন অনেক টাকা হবে তখন আমরা একটা ছোট্ট বাড়ি করব। চারপাশে বাগান আর একটা ছোট্ট গাড়ি কিনব, ডিপ চকোলেট রঙের। নিউ মার্কেট থেকে বাজার করব। সপ্তাহে একদিন পার্ক স্ট্রিটে খাব। স্বপ্ন, স্বপ্ন! যতদিন বাঁচব দু'জনে একদিনও ঝগড়া করব না। আমি কোনোও কারণে রেগে গেলে তুমি চুপ করে থাকবে, তুমি কোনোও কারণে রেগে গেলে আমি চুপ করে থাকব।

দমকা বাতাস দূর থেকে ঝরা পাতা টেনে এনে আমাদের পায়ের কাছে জমা করছে। প্রকৃতি যেন বাসা বাঁধার মালমশলা হাতের কাছে জুগিয়ে দিচ্ছে। নীড়ের স্বপ্ন দেখে পাখি।

কাজল বললে, নাও ওঠো। চলো শালবনে বেড়িয়ে আসি। এমন রাত কি আর সহজে পাবে? চাঁদ দেখলেই মেঘ তেড়ে আসে? সব রাতই যদি চাঁদের আলোর রাত হতো তা হলে!

তা হলে চাঁদের আলোর আর কদর থাকত না।

আমার কেন জানি না উঠে হেঁটে বেড়াতে মন চাইছিল না। বেশ তো বসে আছি দু'জনে। কাজল ছাড়বে না। সে বলবে

দূরে আরও দূরে। অনেক মৃত্যু দেখেছে, তাই জীবনে এত দাম দিতে শিখেছে। সমুদ্র, ঢেউ, চাঁদ, পাখি, অরণ্য, জীবনের যা কিছু সুন্দর, সব এক এক করে তুলে এনে একপাশে সাজাতে চাইছে।

অনেক দূরে একটা ঝিল রয়েছে। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঝিলের জলে। জল থেকে আলোর আভা উঠে আসছে। মনে হচ্ছে প্রকৃতি যেন মণিমুক্তোর বাক্সের ডালা খুলে বসেছেন! দূর থেকে দেখলে মনে হবে আলোর কুণ্ড। যদি কোনোও দিন আত্মহত্যা করি, তাহলে চাঁদের আলোর রাতে এইখানেই ছুটে আসব। রুপোলি পাতের ওপর ধীরে ধীরে দেহটিকে শুইয়ে দেব। একটা দুটো পাখিকে অনুরোধ করব, আমি তোমাদের সারা বছর জল যোগাই, আজ তোমরা আমাকে একটু গান শোনাও। আর তো কোনোও দিন শুনতে চাইব না!

এই তো এরই অপেক্ষায় ছিলুম।

সই করিয়ে দিয়ে গেল। আদালতের সমন। সতের তারিখে এজলাসে মামলা উঠছে বিবাহ বিচ্ছেদের। দেখি আমার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ এনেছে অলকা?

এক নম্বর আমি উদাসীন। গত ছ' বছর বাদীকে শুধু অবহেলাই করে এসেছি। কথায় কথায় অপমান করেছি। কটু কথা ব্যবহার করেছি। এর ফলে প্রতি মুহূর্তে স্নায়বিক চাপের মধ্যে থেকে থেকে বাদী মানসিক ভারসাম্য হারাতে চলেছিলেন। তাঁর শিল্পীজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ধর্মাবতার, অভিযোগ অতিশয় সত্য, তবে এ অভিযোগ বাদীর নয়, বিবাদীর। গত ছ'বছরে ভারসাম্য হারিয়েছি আমি। প্রতিদিন উঠতে বসতে আপনার বাদী আমাকে শুনিয়েছেন, আমি একটি দামড়া, সংস্কৃতিহীন, মূর্খ ব্যক্তি, ইট, কাঠ, পাথরের সঙ্গে আমার কোনোও তফাৎ নেই। ধর্মাবতার, প্রকৃতই কি আমি সেই রকম ব্যক্তি? এই যে, আমার সাক্ষী কাজল চট্টোপাধ্যায়।

কাজল চট্টোপাধ্যায় হাজির?

হাজির।

সত্য বই মিথ্যা বলিব না। আদালত-সমক্ষে সত্য সাক্ষ্য দিব।

বিবাদী সমীর বসু কেমন মানুষ? আপনার সঙ্গে তাঁর কত-দিনের পরিচয়?

প্রায় এক বছর।

তিনি কি নিষ্ঠুর, উদাসীন প্রকৃতির মানুষ? বলুন বলুন, চুপ করে থাকবেন না।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মাবতার, তিনি নিষ্ঠুর, সুবিধাবাদী, স্বার্থপর এবং ইন্দ্রিয়-সেবী পুরুষ, এমন পুরুষ যে কোনোও মহিলার পক্ষেই বিপজ্জনক।

কোনোও প্রমাণ আছে?

অবশ্যই আছে। অ্যাভিনিউ হেলথ্ সেন্টারের ডক্টর হোম, যাঁর কাছে আমার মা হবার সম্ভাবনাকে হত্যা করা হয়েছিল!

কি বলছ তুমি কাজল! ধর্মাবতার, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, আমার সাক্ষী হোস্টাইল হয়ে গেছে। প্রসিকিউসান মহিলা মিথ্যে বলছেন।

অর্ডার, অর্ডার।

কাজল তুমি মিথ্যে বললে কেন?

তোমাকে পাব বলে! সত্যি বললে, জজসায়েব যে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতেন। তুমি আর একজনের হাত ধরে তোমার সেই পুরনো জীবনে ফিরে যেতে। তুমি তো অলকাকে এখনও ভুলতে পার নি।

কে বলেছে? তার নাম শুনলে আমি ঘৃণায় সিঁটিয়ে থাকি।

ঠিক কথা নয় সমীর। মানুষ নিজেকে নিজে চেনে না। গভীর মনে অলকা স্থায়ী আসন পেতে বসে আছে। প্রথমাকে মানুষ

সহজে ভুলতে পারে না। দ্বিতীয়াকে মেনে নিতে হয় বাধ্য হয়ে। যে জমিতে একবার গাছ হয়ে গেছে, সে জমিতে আবার চারা বসাতে গিয়ে দেখবে, মাটি খুঁড়লেই শেকড়ের জালি পদে পদে তোমাকে বাধা দিচ্ছে।

সমন ভাঁজ করতে করতে মনে হলো, আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। যে ঘটনা এখনও ঘটে নি, সেই ঘটনার ছবি দেখছি মনের পর্দায়! কাজলকে কেন সাক্ষী মানব? কাজলকে সাক্ষী করলেই তো ডিভোর্স পেয়ে যাবে অলকা, শুধু যাবে না আমাকে উলটে অ্যাডালটারির চার্জে ফেলে দেবে। চাকরি তো যাবেই এমন কি জেল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে!

বিষ্ণুকে বললুম, আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি। গাড়ি নিয়েই যাচ্ছি। কালই ফিরব। খুব দেরী হলে পরশু। সঙ্গে বিশেষ কিছু নেবার নেই। কাজল এক কাণ্ড করে গেছে, বিছানায় বালিশের পাশে কানের দুল দুটো খুলে রেখে চলে গেছে। জিজ্ঞেস করেছিলুম, দেশে কি এখন আবার সুদিন ফিরে এসেছে যে তুমি দুল পরে রাতের ট্রেনে আসছ? উত্তরটা ভারি সুন্দর, তোমার কাছে একটু সেজে গুজে এলুম। যাচ্ছি যখন দুল দুটো ফেরৎ দিয়ে আসব।

মেঘ রোদের খেলা চলেছে।

পথ চলে গেছে সোজা সরল রেখায় সামনে। বাঁপাশের আকাশে বিহারীনাথ অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলার চেষ্টা করল, তার-পর এক সময় বাঁক ঘুরতেই পাহাড় আমার আকাশের বাইরে চলে গেল। জীপ ছুটছে হু হু করে।

আর কিছু না পারি, গাড়িটা বেশ ভালোই চালাই।

শুভ্র বার লাইব্রেরিতেই ছিল। কিছুকাল আমার সহপাঠী ছিল বলে প্রাণ খুলে কথা বলা চলে।

সমনটা দেখে বললে, বাঙালী মেয়েরা কি হলো মাইরি। দেশটা জ্বালিয়ে দিলে। তুই ডিফেন্ড করতে চাস না, এক্সপার্টি হয়ে যাবে। যদি তুই ছাড়াছাড়ি চাস, তাহলে চুপ করে চেপে বসে থাক। এক তরফা হয়ে যাক।

যদি একটা ফ্যাবুলাস এমাউন্ট খোরপোশ দাবি করে, তাহলে কি হবে?

সে হলো পরের কথা। অস্বাভাবিক কিছু দাবি করলেও আদালতে তা গ্রাহ্য হবে না। যা হবে সবই তোর রোজগারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

কি করা যায় বল তো!

তুই কি কাছে রেখে ফাটলে সিমেন্টর জোড় লাগাতে চাস? সে রকম আঠালো ভালবাসা হলে আয় লড়ে যাই। ভালবাসা? এক সময় খুব ছিল। এখন তলানি কি কিছু পড়ে আছে! বুঝতে পারি না।

আর এক হয় বদমাইশি করে ঝুলিয়ে রাখা। যদি মনে করিস ছেড়ে দিলেই কারুর গলায় গিয়ে ঝুলে পড়বে, তাহলে আয় লড়ে যাই। চলুক বছরের পর বছর।

না, আমার তেমন কোনোও ইচ্ছে নেই।

তাহলে সমন চেপে বসে থাক, যা হবার হয়ে যাক এক্সপার্টি।

শুভ্রর কাছ থেকে উঠে এলুম। মক্কেলে মক্কেলে ঘরে বসার উপায় নেই। সব সময় গুঁতোগুঁতি হচ্ছে। অসুখ আর মামলায় মানুষ জেরবার হয়ে গেল। গাড়ি থাকার এই সুবিধে। ইচ্ছে

মতো যেখানে খুশি চলে যাওয়া যায়। এয়ারপোর্টে কাজলের অফিসে চলে গেলুম। ছুটির সময় প্রায় হয়ে এসেছে। আমাকে দেখে ভীষণ আশ্চর্য হয়েছে। বললে তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি।

মিনিট পনেরর মধ্যেই কাজল অফিস খতম করে চলে এলো।

গাড়িতে বসে বললে, তুমি হঠাৎ এলে? কাজ ছিল বুঝি?

ভীষণ জরুরি।

জানি। তুমি আমার জন্যে কলকাতায় নিশ্চয়ই আসবে না।

আমার আর তোমার কারুরই কি সে বয়েস আছে! অল্প বয়সে মানুষ লাফায়, বয়েস বাড়লে স্থির হয়ে আসে। একটা কথায় একশোটা কথা বলে। ভাব ভাবনার গভীরতা বাড়ে।

আমার শিফ্‌ট ডিউটি হলে তুমি এখানে আমাকে পেতে না।

তোমার হোস্টেলে যেতুম। আমার ব্রিফকেসটা খুলে তোমার দুল দুটো বের করে নাও।

আমি জানি তোমার কাছেই মানিকজোড় পড়ে আছে। আমার বদলে আমার দুলজোড়া তোমার সঙ্গে রাত জাগছে।

জানো, আজ সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি। আগে আমাকে কিছু খেতে দাও।

কোথায় খাবে?

চলো পার্ক স্ট্রিটে যাই। একটু নিরিবিলি চাই, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। যে কোনোও একটা ভালো জায়গার নাম বলো।

কোয়ালিটি।

বেশ তাই হোক।

আমি খাওয়াব।

মামার বাড়ি। আমি থাকতে তুমি কে? আমি এখন অনেক খাব। তুমি খাওয়ালে একটা প্যাসট্রি খাইয়ে ছেড়ে দেবে!

হ্যাঁ, তাই তো বলবে! তুমি যা-খেতে চাইবে তাই খাওয়াব।

ঠিক আছে, তোমার পালা পড়বে আর একদিন।

কোয়ালিটির অন্ধকার কোণে বসে কাজলকে সব কথা খুলে বললুম। এই মাস ছয়েকে কাজল আমার অনেক কাছে সরে এসেছে। যেন, আমার অবিবাহিতা স্ত্রী।

সব শুনে কাজল লাফিয়ে উঠল. যাক বাবা, এত দিনে তুমি রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাবে। তোমার উকিল বন্ধু যা বলেছেন তাই করো। সমন চেপে বসে থাক। এক তরফা হয়ে যাক।

আমার নামে গোটাচারেক বিশ্রী অভিযোগ এনেছে. তার আমি প্রতিবাদ করবো না ?

কি হবে প্রতিবাদ করে ?

আমি জিতবো। জীবনে আমি কখনও হারি নি, আজ এক মহিলার কাছে হেরে যাব !

তুমি জিতলে আমি কোথায় যাব ?

আমি জিতে হারব। প্রথমে জিতব. তারপর ওই মিথ্যেবাদীর বিরুদ্ধে পালটা কেস করব।

কি দরকার বাবা অত ঝামেলায়, সেই আবার চলবে বছরের পর বছর। আমাদের বয়েস বাড়ছে না কমছে ! ভেবে দেখো, আইনের ঝামেলায় যত কম যাওয়া যায় ততই ভালো। তুমি আজ রাতে থাকবে কোথায় ?

ভবানীপুরে আমার এক বন্ধু আছে, রাতটা কোনোও রকমে সেইখানে কাটিয়ে দোব। এক রাতের ব্যাপার। কোনোও রকমে কাটিয়ে দোব। ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ব।

পার্ক স্ট্রিটে নেমে কাজল বললে, তুমি না করতে পারবে না।

কি না করতে পারব না ?

তোমাকে কিছু একটা উপহার দিতে চাই।

তোমার মাথায় মাঝে মাঝে পোকা নড়ে ওঠে তাই না ? খরচ করার জন্যে প্রাণ ছটফট করে ! অত বেহিসেবী হওয়া ঠিক নয়। দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করো। আমি তোমাকে আজ পর্যন্ত কি দিতে পেরেছি !

তুমি যা দিয়েছ পয়সার হিসেবে তার দাম হয় না।

শুনি কি দিয়েছি।

আশা। হোপ।

মেয়েদের মন, সত্যি এত নরম ! ওই জন্যে ঠকে মরে। যাকে দেবে তাকে উজাড় করে দেবে। যাকে দেবে না তাকে কানাকড়িও দেবে না।
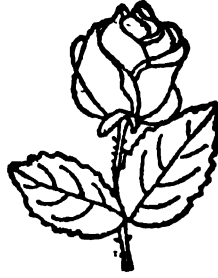
সকাল থেকেই আকাশ খুব মেঘলা। রাত শেষ হয়েও শেষ হতে চাইছে না। দিন মৃদু চোখ খুলেছে। যেন মিটি মিটি চাইছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছে। ধূসর মেঘ উড়ে চলেছে পূব থেকে পশ্চিমে। বাঁধের স্থির জলে আকাশ আজ আর হাসছে না। কালো এক খণ্ড কাঁচের মতো পড়ে আছে। এ আকাশ আমি চিনি। বিরাট এক ঝড় আসছে।

সতের তারিখে আদালতে একবার হাজির হব মনে করেছিলুম। ছটা বছর যার সঙ্গে পাশাপাশি কাটিয়েছি, শেষ বারের মতো একবার তার মুখোমুখি হব। মানুষ কত হৃদয়হীন হতে পারে আমি একবার দেখতে চাই।

কালই সতের।

বেরোতে হলে আজই আমাকে বেরোতে হবে। ঝড় ভেঙে পড়ার আগেই যাত্রা শুরু না করলে গাড়ি চালান খুব মুশকিল হবে। সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছি, তখন বেরিয়েই পড়ি।

বিষ্ণু বললে, আপনার স্যার মাথার ঠিক নেই, এই আকাশ দেখে কেউ বেরোয়, না বেরনো উচিত!

খুব জরুরি কাজ বিষ্ণু।

যা ভালো বোঝেন করুন। কারুর কথা তো শুনবেন না।

কাপুরের পাম্প থেকে ট্যাঙ্কে ডিজেল ভরে নিলুম। কাপুরের ছেলে বললে, কলকাতা যাচ্ছেন?

বললুম, হ্যাঁ।

আপনার সঙ্গে যাবো ?

চলো। একজন সঙ্গী পেলে তো ভালোই হয়। তবে আকাশের অবস্থা খুব খারাপ।

ধীরে চালালে কিছু হবে না। ওয়াইপার ঠিক আছে তো ?

গাড়ি একেবারে পারফেক্ট কনডিশানে আছে।

ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলুম। সন্ধ্যের আগে যদি কলকাতার কাছাকাছি পেঁছিতে না পারি, বরাতে দুর্ভোগ আছে।

দুপুরের দিকে সেই বহু প্রতীক্ষিত ঝড় উঠল। দু'পাশের মাঠ থেকে ধুলো আর শুকনো পাতা ঘুরে ঘুরে আকাশের দিকে ফুঁসে উঠছে। মাঝে মাঝে গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা বাতাসের বেগে গাড়ির বেগ কমে আসছে।

কাপুর বললে, ভয় পাচ্ছেন না কি ?

বিপদের মুখোমুখি হলে ভয় থাকে না ভাই। মানুষ তখন যোদ্ধা। এখন স্পিড কমালেই বিপদ। বাঘের মতো কেটে বেরিয়ে যেতে হবে।

রাত নটা নাগাদ বিধ্বস্ত চেহারায় ভবানীপুরে আমার বন্ধু প্রশান্তর বাড়ি পেঁছে গেলুম। ভাগ্য ভালো। কলকাতার আকাশ সামান্য মেঘলা। বাতাস ছুটছে জোরে। আকাশে তারা আছে।

প্রশান্ত বললে, কোনোও কথা নয়। আগে গরম জলে স্নান। এক কাপ গরম চায়ের সঙ্গে একটা অ্যান্টি অ্যালারজিক। তারপর কথা।

প্রশান্ত সি, এ,। ফ্ল্যাট কিনেছে। মা আর ছেলের সাজান সংসার। বিয়ে-টিয়ে করবে না বলেছে। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর, ব্যালকনিতে বসে দু'জনে অনেক শলাপরামর্শ হলো। আমার আইনজ্ঞ হোমকে আগেই ফোনে জানিয়ে দিয়েছি।

সে বললে, একেবারে শেষ মুহূর্তে ডিফেন্ড করার ডিসিসান নিলি। কি হবে জানি না! সাক্ষীসাবুদ নেই। কেসটা সাজান যাবে না ভালো করে।

আরে, যা হয় হবে।

প্রশান্ত বললে, মনকে যখন প্রস্তুত করে ফেলেছিস তখন আর ভয় কি! হয় এসপার না হয় ওসপার। একটা ঘুম দে ভালো করে। তারপর কালকের কথা কাল হবে।
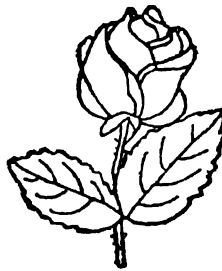
ভোর রাতে ভারি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলুম। ঝিলমিলে সেই জলার ধারে অলকা একা বসে আছে। চাঁদের আলোয় চারপাশ থই-থই করছে। একটা গাছের পাশ থেকে আমি আর অলকা বেরিয়েই দেখতে পেয়ে চমকে থমকে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ, অলকা, অলকা বলে কাজল ছুটে পালাতে লাগল। কাজল ছুটছে, ছুটছে। তার সাদা মূর্তি ক্রমশ চাঁদের আলোয় মিশে গিয়ে ধূপের ধোঁয়ার মতো ঘুরে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাজলের দিকে আর না তাকিয়ে ঝিলের দিকে তাকাতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। অলকা নেই। ফিন্‌ফিনে চাঁদের আলোয় ঝিল হাসছে। আমি ছুটে ঝিলের ধারে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলুম—অলকা, অলকা।

কপালে ভিজে হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলুম। স্বপ্ন না বাস্তব! বাস্তব না স্বপ্ন! আমার মাথার সামনে অলকা। মুখে মৃদু হাসি।

ধড়মড় করে উঠে বসলুম। স্বপ্নের ঘোর কাটে নি, এদিকে বাস্তবের চমক। প্রশান্ত ঘরে ঢুকছে। কাঁধে তোয়ালে।

সুপ্রভাত!

সুপ্রভাত!

উঠে পড় বন্ধু। নিজের মামলা এবার নিজে লড়ো ভাই। এই তোমার আদালত।

প্রশান্তর মা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন, বউমা!

অলকা তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে দিল। তার এই সামান্য সতর্কতা বড় ভালো লাগল। আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। শুধু এইটুকু বলতে পারলুম,

আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

প্রশান্ত বললে, হ্যাঁ বাছা! তাই দেখছো। যাও, মুখ ধুয়ে এসো। চা আসছে।

নির্জন বাথরুমে মুখ ধুতে ধুতে শুধু এইটুকু ভাবতে পারলুম, এমন অবাস্তব ঘটনা ঘটে কি করে!

মুখ ধুয়ে ফিরে এলুম। সন্দেহ হচ্ছে জেগে আছি তো!

প্রশান্ত চা খেতে খেতে বললে, তোরা দু'জনে উকিলকে কত টাকা দিতিস? তার হাফ অন্তত আমার পাওনা। ঘরে যেন আদালত বসে গেছে, একপাশে প্রশান্ত অন্যপাশে মা, জানালার কাছে অলকা, এপাশে আমি। প্রশান্তর মাকে সেই ছাত্রজীবন থেকেই আমিও মা বলে আসছি। তিনি বলেন আমার ছিল এক ছেলে। মৃত্যুর আগে রেখে যাব দুই ছেলে।

মা অলকাকে বললেন, পাগলি, তুমি কি বলে আদালতে ছুটলে! আমরা কি মারা গেছি?

অলকা বললে, আমার ভীষণ অভিমান হয়েছিল।

অভিমান তো হতেই পারে। স্বামীর ওপর অভিমান হবে না তো কি রাস্তার লোকের ওপর অভিমান হবে। সারা জীবনে আমার ওপর দিয়েও অনেক অভিমানের স্রোত বয়ে গেছে। আমি ক'বার কোর্টে দৌড়েছি মা?

আপনাদের কাল আর আমাদের কালে অনেক তফাৎ!

কি তফাৎ মা? সেই একই স্বামী, একই স্ত্রী, একই সংসার। সন্তানের সেই একই মা ডাক। সেই একই সুখ, একই দুঃখ। পৃথিবী বাইরে পালটায় নি মা, পৃথিবী পালটেছে আধুনিকাদের মনে। তুমি যা চেয়েছিলে তা হলে কি সুখী হতে? সত্যি বলবে।

না। সুখী হতুম না।

তাহলে কেন তুমি আদালতে ছুটেছিলে ?

ও কেন আমাকে বলেছিল, তোমার যেখানে খুশি সেখানে যাও। কেন বলেছিল, শিল্পীদের সংসার করা উচিত নয়, তারা অহংকারী হয়। কেন ও আমাকে হাত দিয়ে ঠেলে কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল ? ওর রাগ আমি সহ্য করতে পারি না।

সমীর, বউমা যা বলল, সব সত্যি ?

সব সত্যি। কিন্তু ও কেন প্রতি কথায় আমাকে বলত ইট, কাঠ, পাথর আর সিমেণ্ট নিয়ে যারা দিন কাটায় তারা সব নিরেট দামড়া ? ইডিয়েট ? সংসারে না থেকে তাদের গোয়ালে থাকা উচিত ?

তুমি বলেছিলে মা ?

হ্যাঁ, রেগে গিয়ে বলেছিলুম।

স্বামীকে গরু বলা স্ত্রীর কি উচিত ?

প্রশান্ত বললে, গরুতে আর গুরুতে একটা উ-এর তফাৎ মা। ছাপায় ভুল হতে পারে মা, বলাতেও তো হতে পারে। এখন সেই গরু জীবন যন্ত্রণায় উ করে গুরু হয়ে গেছে।

অলকা বললে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যখন চলে গেলুম ও একবারও আমার কাছে গেল না কেন ?

সমীর, তোমার কিছু বলার আছে ?

আছে মা। আমি যখন তারপরই এক মাস অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলুম ও একবারও এলো না কেন ?

বউমা ?

আমার অভিমান আমাকে আসতে দেয় নি। আর আমি যখন নার্সিংহোমে ও তখন কেন একবায় এলো না ?

সমীর ?

আমার অভিমান মা।

দুটোই ডাহা ছেলেমানুষ। তিলকে তাল করে বসে আছে।

অলকা বললে, আমি অনেকদিন অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

আমিও অনেকদিন অপেক্ষায় থেকে থেকে হতাশ হয়ে পড়েছি।

তোমরা দু'জনেই কানধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাক। দুটোই সমান গরু।

প্রশান্ত হাসতে হাসতে বললে, ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, একেই বলে কাজির বিচার।

মা বললেন, তোমরা দু'জনেই কাছে এগিয়ে এসো।

অলকা ধীরে ধীরে উঠে এলো। এক পলকে তার মুখের যতটুকু দেখতে পেলুম, তাতে মনে হলো ও আরও যেন সুন্দরী হয়েছে। সেই ভীষণ তেজী উগ্রভাব আর নেই। গ্রীষ্মের রোদ যেন শীতের রোদের মতো নরম হয়ে এসেছে।

মা নিজেকে দেখিয়ে বললেন, আদালত ওখানে নেই। আদালত এখানে। ছোট আদালত নয় বড় আদালত।

প্রশান্ত বললে, সুপ্রিম কোর্ট।

প্রশান্তর সাদা অ্যামবাসাডার আজ যেন বিয়ের গাড়ি হয়ে গেছে।

সামনে প্রশান্তর পাশে আমি। পেছনে অলকা আর প্রশান্তর মা। কোর্টে হাজিরা তো একবার দিতেই হবে। মহামান্য বিচারকের সামনে অলকাকে একবার বলতেই হবে, অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলুম।

প্রশান্তকে জিজ্ঞেস করলুম, কি ভাবে কি হলো বল তো ?

খুব সোজা ব্যাপার। তোকে ঘুম পাড়িয়ে গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেলুম অলকাদের বাড়িতে। মাঝ রাত অবধি বোঝালুম। জীবন কি, যৌবন কি, সংসার কি. স্বামী কি, সমীর কে। বোঝাতে বোঝাতে এক সময় অভিমানের বরফ গলে এলো। তোর মানসিক, দৈহিক অবস্থার কথা বললুম, ক্ষমা করিস ভাই। একটা করুণ ছবিই আঁকলুম। ছেলেবেলায় পড়েছিস তো, বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে। অলকাকে ধরে নিয়ে এলুম, মাঝ রাতেই। জানিস তো যুদ্ধের সময় চার্চিল মাঝ রাতে ক্যাবিনেট মিটিং ডাকতেন।

তুই একটা অসাধ্য সাধন করেছিস ভাই। এ ঋণ শোধ করা যাবে না।

এর পেছনে আমার মায়ের ভূমিকাই বেশি। তাঁর পরামর্শেই সব হয়েছে।

গাড়ি আদালত প্রাঙ্গণে এসে ঢুকল। আদালতে এই আমি প্রথম এলুম। বিচিত্র পরিবেশ। সকাল সাড়ে দশটা। এখনই লোকে লোকারণ্য কত রকমের মুখ, কত রকমের সমস্যা। উকিলের পেছনে মক্কেল ছুটছেন, মক্কেলের পেছনে উকিল।

আমার বন্ধু হোমকে খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। অলকা প্রশান্তকে বললে, আমি আমার ল-ইয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি। আপনাদের সঙ্গে আমার এজলাসেই দেখা হবে।

প্রশান্ত বললে, আপনার উকিল কে?

উকিল নয়, ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার পি. এল. ভার্গব!

বাবা করেছেন কি, মশা মারতে কামান দাগা!

অলকা গট গট করে চলে গেল। অভিমানের রেশ মনে লেগে আছে. তা না হলে, সারাটা পথ এমন কি এখানেও একটা কথা বলে নি।

প্রশান্ত বললে, অমন হয়। দীর্ঘদিন তোর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ তো, তাই সঙ্কোচ হচ্ছে।

হোম বললে, চল্, এগারোটা হলো, এজলাসে যাই।

ব্যারিস্টার ভার্গবকে দেখেই চিনেছি। একেবারে সায়েবদের মতো চেহারা। অলকার তরফে অনেকেই এসেছেন অলকার দাদাকেও দেখছি। আর এক ভদ্রলোককে দেখেছি। মুখটা খুব চেনা চেনা। হটাৎ মনে পড়ল, ইনি একজন তরুণ চিত্র পরিচালক। চিত্র পরিচালক কি কারণে এখানে! অলকার পাশে বসে কি এত কথা হচ্ছে!

প্রশান্ত বললে, জেলাস হ'স নি। অলকারও একটা জগৎ আছে। সে একজন প্রখ্যাত শিল্পী। রাইজিং কেরিয়ার।

কস্তুরী এসেছে। এক সময় আমাদের বাড়িতে কাজ করত।

দাবার ছক বেশ ভালোই পড়েছে দেখছি ! জজ সায়েব এজলাসে এলেন। উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান হলো।

ভার্গব উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বললেন। পেশকার জজ সায়েবের টেবিলে কাগজপত্র এগিয়ে দিলেন। বেলিফ উঠে দাঁড়িয়ে ভার্সাস মার্সাস কি সব বলে গেলেন। আমাদের দু'জনের নামও বললেন।

হাঁক পড়ল, অলকা মিত্র।

অলকা মিত্র কেন ? বোস হবে তো। হোম বললে, চুপ, কথা বলিস নি।

ভার্গব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মি লর্ড, অভিযোগকারিণী অলকা মিত্র, একজন নামকরা সংগীত শিল্পী। আসামী সমীর বসু, যিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, তিনি ছিয়াত্তর সালে অলকা মিত্রকে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে বিবাহ করেন। সমীর বসু উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা এবং পদমর্যাদা দিয়ে মানুষ চেনা যায় না। বাদী অলকা মিত্রও চিনতে পারেন নি, যখন চিনলেন, তখন মি লর্ড, ইট ইজ টু লেট, ড্যামেজ হ্যাজ অল-রেডি বিন ডান।

হোম প্রশান্তকে বললে, এ কি মশাই ! এ যে দেখছি বেসুরো গাইছে।

প্রশান্ত বললে, বড় ব্যারিস্টার, মোটা টাকা ফি, দেখুন না লাস্ট মোমেন্টে কি রকম ঘুরিয়ে দেবেন।

আমার কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম মনে হচ্ছে।

ভার্গব বলছেন, একজন মহিলা যখন বুঝতে পারেন, স্বামী সুবিধেবাদী, পরগাছার মতো তার যশ, খ্যাতি আর অর্থ শুষে নিতে এসেছে, ভালবাসা যার অভিনয়, যার চরিত্রের ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না, যে পর-নারীতে আসক্ত, সে মহিলার সামনে তখন একটি রাস্তাই খোলা থাকে, বিচ্ছেদ। ধর্মাবতার, যুগ পাল্টে গেছে। মহিলারা আর স্বামীর ঘরে পড়ে পড়ে অমানুষ স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে রাজী নয়। শিক্ষিতা মহিলারা তো নয়ই। জীবনে একবার ভুল হলে আগে সংশোধনের আর সুযোগ ছিল না। এখন আধুনিক শিক্ষা আর আইন নির্যাতিতা, অসহায়া মহিলার সামনে সে সুযোগ এগিয়ে দিয়েছে। অভিযোগকারিণীকে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

অলকা মিত্র, বেলিফ হাঁকলেন।

অলকা কাঠগড়ায় দাঁড়াল। সেই শপথ বাক্য—সত্য বই মিথ্যা···

আসামী সমীর বসু কেমন মানুষ?

অলকার স্পষ্ট উত্তর, নিষ্ঠুর, উদাসীন, আত্মম্ভর, কর্তব্যবিমুখ, চরিত্রহীন, হি হ্যাজ নো ফিলিংস।

প্রশান্ত দাঁতে দাঁত চেপে বললে, স্কাউনড্রেল, শয়তান। সমীর তুই ডিফেন্ড করবি?

না।

হোম বললে, এক্সপার্টি হয়ে যাক। কি বলিস তুই? এ তো সাংঘাতিক মহিলা!
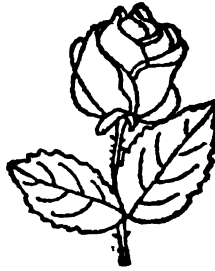
চারটে প্রায় বাজল।

প্রশান্ত তার অফিসে। বাড়ি বসে থাকার উপায় নেই। নিজের ফার্ম। যাবার আগে ও প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। আমি একেবারেই বুঝতে পারি নি সমীর। আমাকে ক্ষমা করিস। মহিলা এমন একটা কুৎসিত চাল চাললেন কেন? আমার মনে হয় শেষ মুহূর্তে ও ওই শয়তান ডিরেক্টরের ক্লাচে গিয়ে পড়েছে।

সারাটা দিন প্রশান্তর মা আমাকে নানা ভাবে, নানা কথা বলে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। এবার আমার সামনে জাতীয় সড়কের মতো সোজা পড়ে আছে জীবনের পথ। আর পেছন ফিরে তাকান নয়। বাঁধন খুলে গেছে। আমি মুক্ত, আমি মুক্ত।

কাজল আজ অফিসে আসে নি।

আবার ফেরা, ফিরে চলা। কাজলের হোস্টেল।

তারিখটা আমার মনে আছে, ৩০শে শ্রাবণ ১৩৮৯। স্বামীর নাম সমীর বসু, স্ত্রীর নাম কাজল বসু। দুজনে এখন ঝিলিমিলির ফরেস্ট বাঙলোয় হনিমুনে। বন্ধু প্রশান্ত পাশের ঘরে নিদ্রিত। সুখের দিবানিদ্রা। এই মাত্র একটা চিঠি এসেছে রিডাইরেক্‌টেড হয়ে কংসাবতী থেকে।

কাজল খুলেছে। পড়তে পড়তে কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ছোট্ট একটি চিঠি,

প্রিয় সমীর.

আমার ব্যবহারে আশ্চর্য হলে। আমার শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত। আমি জানি তোমার আর কাজলের ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে। তোমার সমর্থন না থাকলেও, তোমাকে টেনে নিলে একজনের জীবন শূন্য হয়ে যাবে। শূন্যতায় আমি অভ্যস্থ। শিল্পীর বিচরণ শূন্যতায়। শূন্যতাই সৃষ্টির উৎস। তোমরা সুখী হও। আমি পারি নি। কাজল তোমাকে সুখী করুক। ভালবাসা নিও। ইতি—

একদা তোমার অলকা